শিক্ষাবিভাগের নূতন সার্কুলার ও কারিকুলাম অনুসারে
সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর দ্রুত-পঠনের জন্য নির্বাচিত

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৪৯

দাম—দেড় টাকা

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No. ১৮০৬৭ Date. ৭.৭.....১.

এই পুস্তকের পরিকল্পনায় ও রচনায় বিশেষ ভাবে সাহায্য ক'রেছেন—স্বনামধন্য তরুণ কবি শ্রীপ্রভাত বসু, বন্ধুবর শ্রীসুধেন্দু দাসগুপ্ত, এবং শ্রদ্ধাভাজন শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর এর জন্য এঁদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কলিকাতা : ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট শ্রীপরমানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত।
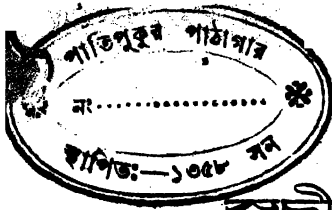
সূচীপত্র

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	...	...	।০
২।	কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য	...	...	।৵০
৩।	কংগ্রেস অধিবেশনের তালিকা	...	...	॥০
৪।	বন্দেমাতরম্	...	...	৸০
৫।	জাগে নব ভারতের জনতা	...	...	৸৵০
৬।	মহাত্মা গান্ধী	......	......	১
৭।	নেতাজী সুভাষ চন্দ্র	...	...	৭
৮।	শ্রীরাজাগোপালাচারী	...	...	১৩
৯।	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু	...	...	১৯
১০।	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	...	...	২৬
১১।	আচার্য কৃপালানী	...	...	৩২
১২।	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ	...	...	৪০
১৩।	আব্দুল গফর খাঁ	...	...	৪৫
১৪।	ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	...	...	৫৩
১৫।	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	...	...	৫৯
১৬।	শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু	...	...	৬৬
১৭।	মৌলবী রফি আমেদ কিদোয়াই	...	...	৭১
১৮।	আচার্য যুগলকিশোর	...	...	৭৫
[illegible]	শংকর [illegible] দেও	...	...	৭৮
[illegible]	সর্দার প্রতাপ[illegible]	...	...	৮২

বিষয় পৃষ্ঠা

২১। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ৮৫
২২। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৯১
২৩। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ১০২
২৪। পরিশিষ্ট (ক) জাতীয় পতাকার ব্যাখ্যা ... ১০৬
" (খ) স্বাধিনতা দিবসের বিবৃতি ... ১১১
" (গ) আগষ্ট প্রস্তাবের সারাংশ ১১৫
" (ঘ) ভারতীয় স্বাধীনতার সনদ ১২২
" (ঙ) কংগ্রেস ওয়াকং কমিটির পনেরই আগষ্টের বিবৃতি ১২৪

———

ভূমিকা
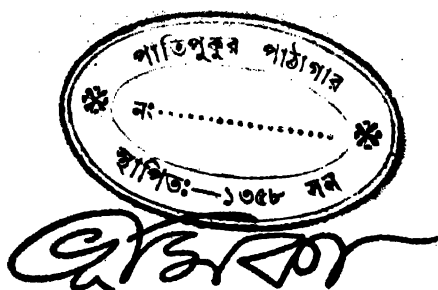
বর্ত্তমান ভারতের ভাগ্যবিধাতা যাঁরা, তাঁদের পরিচয় না জানা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। এঁদের অমূল্য জীবনী নিয়ে যত আলোচনা হয় ততই আমাদের মংগল। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা রচিত হ'ল। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের রূপদাতা সর্বত্যাগী এই সব মনীষীদের প্রত্যেকের সম্পর্কে একখানি করে বই লেখা যেতে পারে। আমাদের লেখকেরা এ বিষয়ে সচেতন হ'লে জাতির কল্যাণ হ'বে। পরম যুগ-সন্ধিক্ষণে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। আশা-আশংকায় মন চঞ্চল। দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মাঝে স্বাধীনতার নব-অভ্যুদয়ের আলো হাতে নিয়ে ভারতের প্রিয়তম জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা এগিয়ে এসেছেন এই সংকট মুহূর্ত্তে। সেই আলো আমাদের ভয় বিদূরিত করে আজ নতুন পথের সন্ধান এনে দিক্। "মাভৈঃ" বলে আমাদের জীবনতরণী ভাসিয়ে দিই মুক্তিপথের অভিমুখে।

বিজয়া দশমী, ১৯৪৭ — প্রকাশক

বন্দেমাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাম্

শস্য শ্যামলাং মাতরম্

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্,

ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্,

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ করালে

দ্বিসপ্তকোটিভূজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে!

বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদল-বারিনীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,

ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা' শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিনী,
কমলা কমল-দল-বিহারিনী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং,
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্!
বন্দেমাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—৺বংকিমচন্দ্র

স্থান	খৃষ্টাব্দ	সভাপতি	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
কলিকাতা	১৯২৮	মতিলাল নেহেরু	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
লাহোর	১৯২৯	জহরলাল নেহেরু	কিচ্‌লু
করাচী	১৯৩১	বল্লভভাই প্যাটেল	গিদ্‌ওয়ানী
দিল্লী	১৯৩২	শেঠ রণছোড়লাল	
কলিকাতা	১৯৩৩	নেলী সেনগুপ্তা	
বোম্বাই	১৯৩৪	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	নরীম্যান
লক্ষ্ণৌ	১৯৩৫	জহরলাল	
ফৈজপুর	১৯৩৭	ঐ	
হরিপুরা	১৯৩৮	সুভাষচন্দ্র বসু	
ত্রিপুরী	১৯৩৯	ঐ (পদত্যাগ করিলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ)	
রামগড়	১৯৪০	আবুল কালাম আজাদ	
মীরাট	১৯৪৬	জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালানী (পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ)	
জয়পুর	১৯৪৮	ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া	

বিশেষ অধিবেশন

বোম্বাই	১৯১৮	হাসান ইমাম	বিঠলভাই প্যাটেল
কলিকাতা	১৯২০	লালা লাজপৎ রায়	ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী
দিল্লী	১৯২৩	আবুল কালাম আজাদ	আন্‌সারী

কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য

"The object of the Indian National Congress is the attainment by the people of India of Purna Swaraj (or Complete Independence) by all legitimate and peaceful means."

—Ariticle 1 (Constitution of the Indian National Congress)

[সর্বপ্রকার শান্তি ও নিরুপদ্রব উপায়ে জনগণের দ্বারা পূর্ণ-স্বরাজ লাভ করা অথবা পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করা ভারতরাষ্ট্রীয় মহাসভার উদ্দেশ্য।

ধারা এক—(ভারতরাষ্ট্রীয় মহাসভার গঠনতন্ত্র)]
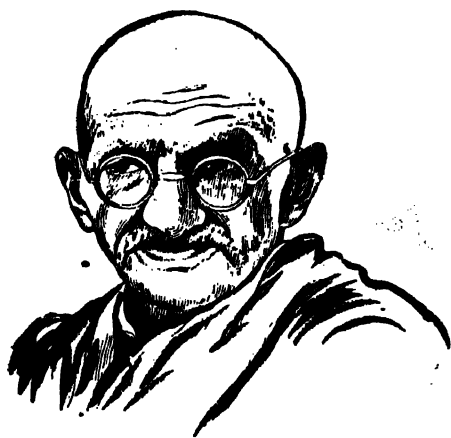
মহাত্মা গান্ধী

মাত্র আটানব্বুই পাউণ্ড ওজনের ক্ষুদ্রকায় সহজ সরল কটিবাস পরিহিত একটী মানুষ আজকের দিনে স্বার্থ লোভ ও দ্বন্দ্ববহুল সভ্যতার মাঝে এক বিস্ময়। বৃটিশের প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই অর্দ্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের কাছে বার বার পরাজয় মেনেছে। অগণিত সেনাবাহিনী, মেসিনগান ও বোমারু বিমানের পশু-শক্তিকে পরাজিত করে চল্লিশ কোটি মূক জনগণের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ইনি ভেঙে ফেলেছেন। ইনি ছিলেন ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক—১৯১৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ।

কাথিয়াবাড়ের এক সামন্ত রাজ্যের দেওয়ান পরিবারে এঁর জন্ম। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ইনি বিলাতে যান, ব্যারিষ্টারী পড়তে। ব্যারিষ্টার হয়ে কিছুদিন রাজকোটে

ও বোম্বাইয়ে প্র্যাকটিস জমাতে না পেরে ইনি চাকরী নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যান। সেইখানে কালা আদমিদের উপর সাহেবদের যে অনাচার, তা অসহনীয় হয়ে ওঠায় ইনি প্রথম তার প্রতিবাদ তোলেন—সে প্রতিবাদ গুলি গোলা বারুদ্ দিয়ে নয়, সে প্রতিবাদ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেদের মনুষ্যত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্য শত্রুর হাতে মরবো কিন্তু শত্রুর গায় আঘাত করবো না, শত্রুকে হিংসা করবো না, মরেও জয়ী হব, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে শত্রুর মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তুলবো। বিশ্বের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই নীতি বিস্ময়কর, কিন্তু এর শক্তি অনতিক্রম্য। এই নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন—

Non violence is not passivity in any shape or form. Non violence as I understand it is the most active force in the world. Its hidden depth sometimes staggar me just as much they stagger fellow workers.

এই অহিংস নীতি সত্যাগ্রহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর মুল উৎস ছিল সত্য। এই সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—আমার কাছে একমাত্র সত্যই সকলের উপরের জিনিষ, এবং তার ভিতরেই আমি অন্য সমস্ত অগণিত বস্তুর সমাবেশ দেখতে পেয়েছি। এই সত্য স্থূল সত্যবাদিতা নয়—ইহা যেমন বাক্যে তেমনি বিচার সম্বন্ধেও সত্য।

ইহা কেবল আমাদের কল্পনা-লোকের সত্য নয়, পরন্তু স্বাধীন চিরন্তন সত্য।

এই সত্য ও অহিংসা দিয়েই তিনি দক্ষিণ-আফরিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সংগ্রামের মূল কথা ছিল, চিত্তশুদ্ধি, চরিত্রের সংযম ও আত্মবিশ্বাস এবং এই নীতিকে জীবনের মাঝে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফরিকায় দুটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন—ফিনিকস্ কলোনী ও টলষ্টয় ফার্ম।

এই দক্ষিণ আফরিকায় যেদিন তার অভিযান সাফল্য মণ্ডিত হোল, সেদিন তিনি বিশ্বের রাজনীতি-ক্ষেত্রের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

দক্ষিণ আফরিকা থেকে তিনি এলেন ভারতবর্ষে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যেও তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবিধান করার উদ্দেশ্যে তিনি সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন সুরু করলেন—অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন অহিংসার ভিতর দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল, এবং যখনই হিংসার প্রকাশ পেত তখনই নিজে অনশন করতেন অনুগামীদের আত্মশুদ্ধি কামনা করে।

১৯২২ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে কারারুদ্ধ করলো বটে কিন্তু তাঁর প্রভাব থেকে ভারতবাসীর মনকে মুক্ত করতে পারলো না। ইংরাজেরা ভারতবর্ষের চল্লিশকোটি নরনারীকে যেভাবে ব্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে শোষণ করে চলেছিল, তার প্রতিবিধান

করার জন্য তিনি খদ্দরের প্রবর্ত্তন করেন। ভারতবাসী ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই মোটা কাপড় নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। একটা সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য এমন অভিনব অস্ত্র ইতিপূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দেশে প্রযুক্ত হয়নি।

অসহযোগের পর গান্ধিজী আরো দুটি আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন, আইন-অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। শেষ আন্দোলনটী যেরূপে ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, জনগণ নিরস্ত্র হলেও তাদের নৈতিক সহানুভূতি ছাড়া সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে না। সেজন্যই পরিশেষে তাদের ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয়। শুধু বিদেশী শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধেই যে গান্ধিজী জনমতকে জাগ্রত করেছিলেন তা নয়, স্বদেশের সমাজ ব্যবস্থায় যে বৈষম্য প্রত্যক্ষ করেছেন তার বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেছেন। অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তিনি হরিজন আন্দোলন করেন। তিনি বলেন—

> 'আমার যদি আবার জন্ম হয় তা'হলে যেন অস্পৃশ্য হয়েই জন্মাই, তাহলে তাদের সেবা করার বেশী সুযোগ আমি পাব।'

দিল্লীর ভাংগী পল্লীতে তিনি বহুদিন অতিবাহিত করেন। নিরক্ষরতা ভারতের আরেকটা অভিশাপ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা' পাবার সৌভাগ্য যাদের হয় তারাও জাতীয় ভাবোদ্দীপক শিক্ষায় শিক্ষিত হন না। এই পদ্ধতির আমূল

পরিবর্তন করার জন্য গান্ধিজী বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। এই শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা,—অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী শিক্ষাও তারা লাভ করবে। এই ধারা চললে ভারতের শিক্ষা-ধারায় একটা রীতিমত ব্যাপক বিপ্লব ঘটে যাবে।

রাজনীতিক ও সামাজিক দিক ছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে গান্ধিজী বিপ্লবের উদ্বোধন করে গেছেন। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে যে অর্থগত অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে তা কল্যাণকর নয়, একথা গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এই বৈষম্য দূর করার যে পথ মার্কস, এংগেল ও লেনিন নির্দেশ করেছেন, গান্ধিজী সেই রক্তাক্ত বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন—সংগীনের ভয় দেখিয়ে সব মানুষকে সাময়িকভাবে হয়তো একই স্তরে টেনে আনা যায়, কিন্তু স্থায়ী সাম্য তাতে আসে না, মানুষের অন্তরের পরিবর্তন করার প্রয়োজন। শ্রমিককে আত্মশক্তি উপলব্ধি করতে হবে। সেজন্য তাদের শিক্ষার প্রয়োজন। আর তারই সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও কুটীরশিল্পের সুযোগ দিতে হবে। শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ হলে সমস্ত মুনাফা এক হাতে সঞ্চিত হতে পারবে না। কুটির-শিল্প প্রতিটি পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করবে, গ্রামগুলি আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা আবার সরল, সহজ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ত্রিশ বছর গান্ধিজী ছিলেন কংগ্রেসের কর্ণধার। কংগ্রেস

বলতে গান্ধিজীকে বোঝাতো। রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক, সর্বক্ষেত্রেই গান্ধিজী ভারতের বৈদান্তিক আদর্শে বৈপ্লবিক চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মননশীলতার উৎস ছিল সত্য ধর্ম।) তাঁর এই নব্যনীতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করেছে, আজকের সভ্যতার যে পাশবিক প্রকাশ আনবিক বোমার চরম রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাকে প্রতিরোধ করার যে মানবিক ধর্ম, গান্ধীবাদ সেই মহামানবতার প্রতীক। সেই দিক থেকে গান্ধিজীর মৃত্যু যতই শোকাবহ হউক না কেন তা প্রকৃত বিপ্লবীর মৃত্যু। অন্যায়কে যিনি ন্যায় দিয়ে, পশুত্বকে যিনি মানবতা দিয়ে, মিথ্যাকে যিনি সত্য দিয়ে, দুর্নীতিকে যিনি ধর্ম, দিয়ে জয় করতে চান, অন্যায় তাঁকে সহজ ও সরলভাবে স্বীকার করবে কেমন করে? কিন্তু সত্য ও মানবতার তো মৃত্যু নেই, দুর্নীতি ও পশুত্বই একদিন কালের অন্ধকারে লীন হয়ে যাবে। সেদিন পৃথিবী নতুন সভ্যতার আলোকে পিছন পানে তাকিয়ে এই শীর্ণ মৃত্যুঞ্জয়ী সন্ন্যাসীকে স্মরণ করবে —শ্রদ্ধা জানাবে। স্বাধীন ভারত সেই নবীন সভ্যতার আজ উদ্বোধন করছে মহামানবের পুণ্য-স্মৃতিকে স্মরণ করে। ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও বৈষম্য দূর করে যেন আমরা নতুন ভারত গড়তে পারি, ভগবান আমাদের সেই শক্তি দিন, ইহাই আজ আমাদের প্রার্থনা!

বাংলাদেশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বাংলার সেই বিপ্লবী যৌবনের প্রতীক। যেদিন আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরাজ সরকারের লোভনীয় চাকুরী গ্রহণ না করে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে স্বদেশ সেবার দীক্ষা নিলেন ভারতের সে এক শুভমুহূর্ত। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপ্রচেষ্টার যে রাজনৈতিক দিকটা বাকী ছিল, সুভাষচন্দ্র তা সম্পূর্ণ করে গেলেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনী ঘটনা বহুল। ত্যাগ ও জনসেবার নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কল্যাণ কামনায় তিনি আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন, যে স্বাধীনতা আজ আমরা লাভ করেছি তাতে সুভাষচন্দ্রের অবদানও কম নেই। সুভাষচন্দ্রের প্রেরণার উৎস ছিল স্বামী-বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী। কিশোর বয়সে সদগুরুর কাছে সাধনা করার উদ্দেশ্যে তিনি একবার গৃহত্যাগ করেছিলেন। হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া প্রভৃতি স্থানে বড় বড় সাধুদের সঙ্গে তিনি

দেখা করেন, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও বিলাস, নীতি ও ধর্মপদ্ধতি তাঁর মনোমত না হওয়ায় তিনি যেমন অকস্মাৎ একদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন তেমনই অকস্মাৎ একদিন স্বগৃহে ফিরে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়বার সময় একটী ঘটনা থেকে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সাহেব অধ্যাপক মিঃ ওটেন ছাত্রদিগের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করেন। সুভাষচন্দ্র ধৈর্য্য হারিয়ে সেই ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষা দেন। তার ফলে তাঁকে কলেজ থেকে দু'বছরের জন্য বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে পাঠ শেষ করবার সুযোগ পান। সেখান থেকে বি-এ পাশ করে তিনি বিলাতে যান আই-সি-এস পড়তে। আই-সি-এস পাশ করে তিনি চাকরি নিলেন না, ক্যামব্রিজ থেকে বি-এ অনার্স ডিগ্রি নিয়ে ১৯২১ সালে দেশে ফিরলেন। তখন গান্ধিজী দেশব্যাপী অসহ-যোগ আন্দোলন সুরু করেছেন। বাংলাদেশে দেশবন্ধু জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, সুভাষচন্দ্র সেই কলেজের অধ্যক্ষ ও কংগ্রেস-কমিটীর প্রচার-সচিবের পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর কর্মকারিতা দেখে ষ্টেটস্‌ম্যানের মত কাগজ লিখলো—

> বৃটিশ সরকার একজন শক্তিমান কর্মচারীকে হারালেন কংগ্রেস তাঁকে লাভ করলো। বসু প্রচার-কার্য্যে সিমলাকেও হার মানাইয়াছে!

এর কিছুদিন পরে যুবরাজ ভারতে আসেন, এবং তাঁর

অভিনন্দনের দিনে পূর্ণহরতাল ঘোষণা করা হয়। সেই সম্পর্কে কংগ্রেসের বহু নেতা গ্রেপ্তার হন, সুভাষচন্দ্রেরও ছয়মাস কারাদণ্ড হয়।

পর বৎসর কারামুক্ত হয়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। এই সময় উত্তর বংগের এক অংশ প্রবল বন্যায় ভেসে যায়।

বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্য্যে সুভাষচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তারপরেই তিনি দেশবন্ধু পরিচালিত ফরোয়ার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদ লাভ করেন। কিন্তু সে পদে বেশীদিন তাঁকে কাজ করতে হয় নি। কয়েক মাসের মধ্যেই সরকার তাকে তিন বছরের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করেন। ১৯২৭ সালে মুক্ত হয়ে এসে কিছুদিন দেশ সেবা করবার পর আবার তিনি দণ্ডিত হন। ১৯৩০ সালে কারাগারে অবস্থান কালেই তিনি কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। বার বার জেল খেটে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ভালোমত চিকিৎসা করার জন্য ১৯৩৩ সালে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেন। মাঝে একবার পিতৃবিয়োগের সময় তিনি কয়েক দিনের জন্য ভারতে আসেন, পরে ১৯৩৬ সালে সুস্থ হয়ে ভারতে পদার্পণ করা মাত্রই তাঁকে অন্তরীণ করা হয়।

পর বৎসর মুক্তি লাভ করে ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। পরবর্ত্তী ত্রিপুরী

কংগ্রেসেও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত তাঁর মত বিরোধ হওয়ায় তিনি সভাপতিরপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই নির্বাচনের সময় কংগ্রেসী বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের জয়কে নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করেন। দক্ষিণপন্থীরা সুভাষ চন্দ্রকে স্বমতে আনতে না পেরে কংগ্রেস থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেন। সুভাষচন্দ্র নিজ মতাবলম্বীদের নিয়ে ফরোয়ার্ড-ব্লক গঠন করেন এবং ১৯৪০ সালে রামগড়ে এক আপোষ-বিরোধী-সম্মেলন করেন। এই সম্মেলনীতে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন—

আমার সমস্ত জীবনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ও আপোষবিহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। চিরজীবন ব্যাপিয়া আমি ভারতের সেবক। আমার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভারতের সেবকই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি বাস করি না কেন, একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আনুগত্য ও অনুরাগ আছে এবং চিরকাল থাকিবে !

একথা যে কতদূর সত্য, তাঁর পরবর্তী কার্য্যকলাপে তিনি তা প্রমাণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি অকস্মাৎ কলিকাতার বাস-ভবন থেকে অন্তর্হিত হন, পরে শোনা যায় যে তিনি জার্মানী হইয়া জাপানে গিয়ে পৌছেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডের তখন মহাসংকটকাল। মালয়, ব্রহ্মদেশ

ও সিংহপুর তখন জাপানীরা জয় করিয়াছে। সেখানকার ভারতীয়দের নিয়ে সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ-বাহিনী গঠন করলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাঁর সর্বাধিনায়কত্বে আজাদ-হিন্দ-বাহিনী ভারতব্রহ্ম সীমান্ত, আরাকান, টিড্ডিম, কোহিমা, ইম্ফল প্রভৃতি স্থানে দুর্বার বেগে আক্রমণ চালায়। মণিপুরে ভারতীয়-জাতীয়-বাহিনী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। স্বাধীনতার বিজয়বাণী আকাশে বাতাসে সাড়া তোলে—জয় হিন্দ! সুভাষচন্দ্র ভারতের বাহিরে স্বাধীন আজাদ-হিন্দ-গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেন। নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র ইহাকে বিনাদ্বিধায় স্বীকার করে। যে কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়িত করেছিলেন, বিপ্লবী সুভাষ নিজের বৈশিষ্ট্যে সেই গ্লানি মুছে দিয়ে স্বাধীনতা উন্মুখ ভারতবাসীর চিত্ত জয় করেন।

আজাদ-হিন্দ ফৌজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি। আজাদ-হিন্দ ফৌজে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না; তাদের জীবনে একটি মাত্র সত্য ছিল—বুকের রক্ত দিয়েও ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করতে হবে। দিল্লীর লাল্‌ কেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে।

উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ইম্ফল পার হয়ে অগ্রসর হতে পারেনি সত্য, কিন্তু পরাধীন ভারতবাসীর মনে তারা যে উন্মাদনা এনেছিল, তা ভারতের

স্বাধীনতালাভে সহায়ক হয়েছে। জাপানের এক সংবাদে প্রচারিত হয় ১৯৪৫ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিন্তু নেতাজীর তো মৃত্যু নেই। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র—আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর নেতাজী সুভাষ—কখনও মরতে পারেন না! ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি চিরন্তনকালের অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ ভারতবাসীর মনে যুগে যুগে ভাবোন্মাদনা জাগাবে—তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতিকে স্মরণ করে ভারতবাসী তার স্বাধীনতার জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হবে—গর্বোজ্জ্বল হৃদয়ে তাঁর বাণী স্মরণ করবে—জয় হিন্দ্‌!

বাংলাদেশের মত মদ্রদেশও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধ। রাজনীতিক্ষেত্রে মাদ্রাজ প্রদেশের দান বড় কম নয়। রাজাগোপালাচারী পাণ্ডিত্য ও রাজনীতিজ্ঞানে সেখানকার একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ সাঙ্গ করে আইন-ব্যবসা সুরু করলেন, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় তা পরিত্যাগ করে আদর্শের প্রতি পরম নিষ্ঠার পরিচয় দেন। তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯২১-২২এ তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। কংগ্রেস-শাসিত মাদ্রাজ প্রদেশের তিনি প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় অস্পৃশ্যতাবর্জন ও মাদকনিবারণ আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করে।

শ্রীরাজাগোপালাচারী একজন সুলেখক। ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কীয় তাঁর বইগুলি খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। গান্ধীজীর পত্রিকা "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র তিনি সম্পাদক ছিলেন কিছুদিন,

তাঁর প্রবন্ধগুলি যুক্তি-বিবেচনার দিক দিয়ে অমূল্য! শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় আইন প্রসঙ্গে তাঁর মতই প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়। তামিল ভাষায় তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলি অনবদ্য। মাদক-নিবারণী পুস্তিকারও তিনি প্রণেতা। জাতিকে এ কদভ্যাস থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি যতখানি পরিশ্রম করেছেন আর কেউ বোধ হয় তা করেন নি। দর্শন সম্বন্ধেও রাজাগোপালের লেখাগুলি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁর বন্দীনিবাসের "রোজনামচা" নানাভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এই নেতা খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। ভাবাবেগ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। জনতাকে আকর্ষণ করবার মত চরিত্রের গঠন তাঁর নয়। আলোচনা বা বিতর্ক-সভাতেই তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তা ছাড়া ১৯৪০ সালে ইংরাজকে যুদ্ধে সাহায্য করবার প্রস্তাব উত্থাপন করায় অনেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিল। তবু সরকার বাহাদুরের কোপদৃষ্টি তিনি এড়াতে পারেন নি। ভারতরক্ষা-বিধানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪২ সালে মতভেদ হওয়ার ফলে রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি কৃপালানী আবার এই শ্রদ্ধেয় নেতাকে পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মদ্রদেশের অনেকেই হয়ত এই মনোনয়নের পক্ষপাতী ন'ন। তবু আমাদের এ বিশ্বাস আছে, এই প্রধান নেতা দেশের কল্যাণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতেও

কুণ্ঠিত হবেন না। তা ছাড়া মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রাজাগোপালাচারীকে "দক্ষিণ-ভারতের গান্ধী" বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সরল অনাড়ম্বর জীবন, ঈশ্বরে বিশ্বাস, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর চরিত্র মহাত্মাজীর সংগে তুলনীয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি গান্ধীজীর বৈবাহিক—রাজনৈতিক জীবনেও তাঁদের সম্পর্ক তেম্‌নি ঘনিষ্ঠ! উচ্চকুলজাত ব্রাহ্মণ হয়েও গুজরাতী বাণিয়া ছেলের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন্‌নি। মদ্রদেশীয়ের পক্ষে এমন সংস্কারমুক্ত হওয়া বড় কম কথা নয়। যে দেশের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ায় না, সেখানে এমন উদার মতাবলম্বী মানুষ পাওয়া সত্যই আশ্চর্যের কথা। বর্ণ বা জাতির কোনো প্রভেদ রাজাগোপালাচারী স্বীকার করেন না। সদ্‌ব্রাহ্মণ হয়েও হরিজনকে কোল দিতে তাঁর এতটুকু আপত্তি নেই। মাদ্রাজের কত প্রাচীন মন্দিরের রুদ্ধদ্বার আজ অস্পৃশ্যদের সামনে মুক্ত হয়ে গেছে। রাজনৈতিক চেতনার সংগে সংগে সামাজিক সংস্কারের প্রসার রাজাগোপালাচারীর জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। গান্ধীবাদ প্রচারেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তির কাছে কত প্রতিপক্ষই না পরাভূত হয়ে মহাত্মাজীর আদর্শে আস্থাবান্‌ হয়েছে। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে গান্ধীজি-পরিকল্পিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

রাজাগোপালাচারীর অনমনীয় মনোভাবের আমরা পরিচয় পাই গয়া কংগ্রেসে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আইন-পরিষদে যোগ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। আর রাজাগোপাল চেয়েছিলেন বয়কট্ আন্দোলন চালাতে। তাঁর বিরোধিতার ফলেই দেশবন্ধুকে কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ ক'রে 'স্বরাজ্য পার্টি' গড়ে তুলতে হয়। অথচ আশ্চর্য এই, পনর বছর পরে রাজাগোপালাচারীই নির্বাচন দ্বন্দ্বে কংগ্রেসকে জয়ী করে তুলেছেন, প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব গঠিত হয়েছিল। পরম অসহযোগী কালের পরিবর্তনে মাদ্রাজের প্রথম নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করলেন। এই রূপান্তরের মুলে গঠনমূলক কর্মপন্থায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করার বাসনাই নিহিত রয়েছে। রণক্লান্ত বিদ্রোহী আজ জাতীয় জীবনকে সংস্কৃত করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর অপূর্ব মেধা কংগ্রেসের সংগঠনকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছে। সর্দার প্যাটেল যদি কংগ্রেসের 'দক্ষিণ হস্ত'স্বরূপ হন, তবে শ্রীরাজাগোপালাচারী তার "মস্তিষ্ক"।

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী নিজের হাতে কাপড় কাচছেন, এ দৃশ্য যে দেখেছে সে বুঝতে পারবে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বৈশিষ্ট্য কোথায়। Plain living and high thinkingএর জীবন্ত প্রতীক রাজাগোপালাচারী। সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই আমাদের অজেয় শক্তি লুকিয়ে আছে। চরিত্রের শক্তি, আত্মিক বলই যে আমাদের রাজনৈতিক

জীবনের ভরসা, রাজাগোপালাচারী তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মিথ্যা বা বাইরের চাকচিক্য দিয়ে জনগণকে ভুলিয়ে তাদের নেতা সাজা যায় না। চাই আত্মত্যাগ, রাজনীতিজ্ঞান এবং মানবের প্রতি দরদ। এই গুণগুলি রাজাগোপালাচারীর যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

দেশকে অন্তর্বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি জিন্নার পাকিস্তানদাবীও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। যদিও তাঁর এই মতবাদ কেউ গ্রহণ করেন নি, তবু এটুকু বোঝা যায় যে, দেশে শান্তিস্থাপন ও জাতীয় সরকার গঠনের জন্য তাঁর কতখানি আন্তরিক ব্যাকুলতা। রাজাগোপালাচারী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে হয়ত দু'একবার ভুল করেছেন, কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয়। যুক্তিবাদী, দৃঢ়চরিত্র এই নেতা আমাদের দেশকে জগৎসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। পুরু রঙীন চশমায় তাঁর চোখ দুটি ঢাকা থাকে বটে কিন্তু তাঁর অন্তরের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং সত্যান্বেষী। আদর্শবাদকে যিনি জীবনের মহামন্ত্র করে নিয়েছেন, তিনিই ভারতের রাষ্ট্রপালের পদে আজ জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতীক!

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সালেম জেলার একটি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। মেধাবী ছাত্র হিসাবে এবং পরে বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী-রূপে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। অন্যান্য দেশনেতাদের মতই অর্থের কোনো আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল

না। এই একনিষ্ঠ দেশ সেবক যে দীর্ঘদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য, অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের মন্ত্রী এবং স্বাধীনতা অর্জনের প্রত্যুষে পশ্চিম বাংলার গভর্ণর মনোনীত হয়েছিলেন, তা'তে আশ্চার্য্য হবার কিছু নেই। কল্‌কাতায় শ্রীরাজা-গোপালাচারী যেরকম বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছেন, খুব কম নেতার ভাগ্যেই তা ঘটেছে। তিনিও মনপ্রাণ ঢেলে বাংলা ও বাঙ্গালীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপাল হিসাবে জাতির নব-ইতিহাস রচনায় তাঁর স্বাক্ষর উজ্জ্বলতম হোক্‌!

সমগ্র পৃথিবীর শান্তি যে ক'জনের উপর নির্ভর করছে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁদের মধ্যে একজন। শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রিরূপে নয়, বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে তাঁর স্থান ষ্ট্যালিন, ট্রুম্যান, এটলীর পাশেই। সমগ্র জগৎ আজ এই জনগণমন-অধিনায়কের দিকে চেয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখতে পাবে বলে। এই দুর্দম লোকটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে বদ্ধপরিকর; তাঁকে কূটনীতির চালে ভুলানো দুষ্কর ব্যাপার। বড়লাটের অপসারণ দাবী করতেও যিনি কুণ্ঠিত হন্‌নি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়বার জন্য যিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন তাঁর ওপর মুক্তিকামী দেশবাসীর সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

সমগ্র বিশ্বের বাসিন্দা জওহরলাল। ভারতবর্ষের গণ্ডী তাঁকে বাঁধতে পারে না। সুদূর স্পেন, চীনের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে—নিপীড়িত আবিসিনিয়া ও ইন্দোচীনের সাহায্যে তিনি ছুটে যান—দেশীয় রাজ্য, সীমান্তের উপজাতি, সব কিছুর দিকেই তাঁর সমান দৃষ্টি। বিভিন্ন দেশের মুক্তি-আন্দোলন তাঁর শুভেচ্ছা পেয়েছে—তিনিও সবদেশের অধিবাসীর কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায়। আজাদ্-হিন্দ্ ফৌজের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি সরকারের সংগে লড়লেন, আবার কাশ্মীর কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি, অপমান উপেক্ষা করে জন-গণের দাবী নিয়ে সেখানে এগিয়ে গেলেন। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পণ্ডিতজী বীরদর্পে ঘোষণা করলেন,—যদি একটি মুসলমানের গায়ে হাত দিতে চাও তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে মাড়িয়ে তোমাকে যেতে হবে।

সেই সময় মুস্লিম জগতের নেতা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বক্তৃতা দিয়ে ভারতের আকাশকে বিষবাষ্পে ভরিয়ে তুলছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমান প্রিয় পণ্ডিত জওহর-লাল। উচ্চকুলজাত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁর মতবাদ অত্যন্ত উদার। সীমান্ত ভ্রমণের সময় উপজাতীয় মুসলমানরাও তাঁর প্রতি অবিচলিত আস্থা জানিয়েছে। শিখ, খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই স্পষ্টভাষী অনমনীয় নেতাকে শ্রদ্ধা ও ভীতির চক্ষে দেখেন। য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ কতবার তিনি ঘৃণায় উপেক্ষা করেছেন। পুলিশের লাঠি, সৈনিকের

সঙ্গীন তাঁর সামনে বিফল হয়েছে। চির-তারুণ্যের প্রতীক জওহরলাল। তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি অসীম। নির্বাচন সফরের সময় চার মাসে তিনি চল্লিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছেন ; এরোপ্লেন, রেল, মোটর, লরী, ঘোড়া, গরু ও উটের গাড়ীতে, সাইকেলে, বোটে, হাতীর পিঠে, পায়ে হেঁটে, দিন পিছু বারোটি করে বক্তৃতা দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন জওহরলাল। লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তর জয় করে, তাদের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে সর্বজনবরেণ্য নেতার স্থান তিনি সহজেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর অসীম আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হয় নি।

১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর ধনীশ্রেষ্ঠ মতিলালের ঘরে এই অগ্নিস্ফুলিংগের জন্ম হয়। পিতার মেধা, দৃঢ়চরিত্র, মায়ের দরদী মন, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি নিয়ে জন্মেছিলেন জওহরলাল। বয়সের সংগে বীর্যের নবপ্রকাশ সূচিত হল তাঁর জীবনে। প্রথম জীবনে ধর্মাসক্তি, পরের জীবনে কর্মোন্মাদনা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংগে স্বদেশপ্রেমের মিলন হ'ল।

ব্যারিষ্টার জওহরলাল নেহেরু রূপান্তরিত হলেন দুর্জয় সেনানায়কে। স্বাধীন ভারতের স্রষ্টা তিনি। কংগ্রেস-নায়কদের পরিমণ্ডলে সূর্য্য তিনি। তাঁর জ্যোতিতে ভারতভূমি আলোকিত। রাজার কুমার দেখা দিলেন চাষীর বন্ধুরূপে, কিষাণের সংগী হিসাবে।

বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থের রচয়িতা জওহরলাল ; কিন্তু তার

চেয়েও বড় কথা, ভারতের নব-ইতিহাসের স্রষ্টা তিনি। জগতের ইতিকথা তাঁর নখদর্পণে। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা সর্বজনস্বীকৃত। তবু ভারতের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছেন বলেই তিনি সর্বকালে পূজা পাবেন। বিজ্ঞানে তাঁর প্রচণ্ড অনুরক্তি। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিত্বও তিনি করেছেন। ভারতকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ—মতবাদ সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর আধ্যাত্মিকতা যেমন ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে পবিত্র করে তুলেছে, পণ্ডিত জওহরলালের সতেজ কর্মনৈপুণ্য তাকে প্রাণচঞ্চল, বেগবান্ করেছে।

১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস আমাদের দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করেছিল। জওহরলালের সভাপতিত্বে সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবেগ শতগুণ বেড়ে গেল। স্থির হল, ২৬শে জানুয়ারী পালিত হ'বে 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে। জাতির জীবনে প্রাণের জোয়ার এলো। শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী সমবেত কণ্ঠে গাইল—"ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা!"

চল্লিশ বছর বয়সে পণ্ডিতজী একই সংগে জাতীয় মহাসভার রাষ্ট্রপতি এবং নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রমিক-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। অহিংসাকে গ্রহণ করলেন অমোঘ অস্ত্ররূপে। ১৯৩৫এ লক্ষ্ণৌয়ে ও ১৯৩৬এ ফৈজপুরেও জাতীয় মহাসভার সভাপতিত্ব

করেছিলেন জওহরলাল। ১৯৪৬ সালেও কিছুদিনের জন্য এই পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

আজ জাতীয় জীবনের পরম সন্ধিক্ষণ। নেহেরু শাসনতন্ত্রকে ব্যর্থ করবার জন্য লীগ ও আমলাতন্ত্র ঘোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মৃত্যু, দারিদ্র্য, বুভুক্ষার পটভূমিকায় আমাদের স্বাধীনতা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান স্বরু হয়েছে। তবু পণ্ডিত জওহরলাল দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন ঃ

> "আমি রক্তপাতকে ভয় করি না। দেশের বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধ আমাকে বিচলিত করিলেও অবস্থার প্রতিকারের জন্য সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়াই আমি আশা করি। কংগ্রেস অতীতে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে এবং বর্তমান সংকটেও কংগ্রেস তাহার দায়িত্ব পালনে বিমুখ হইবে না; যদি ইহাতে আমাদের কয়েকজনকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তবুও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।'

ভারতবাসীর বহুভাগ্য, এমন অপরাজেয় নেতা আমাদের দেশে জন্মেছেন। লাঞ্ছিত, পরাধীন, অশিক্ষিত, দরিদ্র ভারতবর্ষ আজ জেগে উঠেছে। মৈত্রী ও মুক্তির বাণী সে পৌঁছে দিয়েছে দিগ্বিদিকে। এই সফলতার মূলে জাতির প্রিয়তম নেতা জওহর-লালের দান কতখানি, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তার পরিমাপ করবে।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সম্মেলনের স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন জওহরলাল। তিনি লিখেছেন, "You cannot isolate a

country and live apart from the other countries of the world. We talk in terms of independence and democracy. We want independence but that does not mean isolation. To-day in the world not even the biggest countries can afford to live isolated. We are to be one of the members of the world community, but that must be on equal terms with the others. We are not going to submit to any other nation. As an independent nation we shall join the world community and also seek a solution of world problems in co-operation with other nations."

বাংলার কবি এই সুরেই গেয়েছিলেন—

বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নির্দেশে নিষ্ঠুর ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরাও মুক্তিকামী ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে রক্তলোলুপ

অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় এই নেতার প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। স্বাধীন ভারতের মৈত্রীর বাণী বহন করে আজ চক্রশোভিত ত্রিবর্ণ নিশান মস্কো, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, চুংকিং-এর উর্দ্ধগগনে উড্ডীয়মান।

সম্প্রতি মার্কিন রাজদূত Dr. Grady বলেছেন—

"I think your Prime Minister is an unusual man, a man of great qualities of heart and mind. There are few men in the world to-day who have these great qualities of mind and heart, and I think under his leadership, under the leadership of Pandit Nehru, your country will grow rapidly to be one of the world leaders"

বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরই সারা জগতের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করতে পেরেছেন সর্বজনপ্রিয় অধিনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল। তাঁর নেতৃত্বে এই মহাদেশে কিষাণ-মজদুরের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

সর্দার বল্লভভাই সম্পর্কে গান্ধীজী লিখেছেন, "Vallabhbhai has a marvellous capacity for separating wheat from chaff. He is no visionary like Jawaharlal or me. If he has any sentiment, he has suppressed it. He is a strong-minded man and if he makes up his mind, it is final. I ask you to obtain the setting from Jawaharlal and details from Vallabhbhai."

অল্প কথায় তাঁর চরিত্রের এত সুন্দর বর্ণনা আর কেউ দিতে পারতেন না।

সর্দারজী কংগ্রেস-পরিচালকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। ১৮৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর গুজরাতের কায়রা জেলায় তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদ অলংকৃত করেছেন। লোকে তাঁকে Iron Dictator বলে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই লোকটিকে বাঘের মত ভয় করে বিদেশী সরকারের কর্মচারীরা। সামান্য ত্রুটিও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় না। অন্যায়কে টুঁটি টিপে মারতে সর্দারজী পেছ্-পাও হন না। মীরাট কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা অনেকের প্রাণেই ত্রাস-সঞ্চার করেছে। বক্তৃতাপ্রসংগে তিনি বলেছিলেন,—

"বাধ্য না হইলে কিংবা জগতের সামনে বৃটিশের মুখে কালি লেপিয়া না দিয়া অন্তর্বর্তী সরকার আমরা ত্যাগ করিব না।...আমরা ঝগড়া করি আর নাই করি বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিতেই হইবে!"

সরকারী কর্মচারীদের লক্ষ্য করে বলেন,—

"যাঁহারা বিশ্বস্তভাবে কার্য না করিবেন, তাঁহাদিগকে অপসারিত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না!"

সরকারী পদে বিদেশী নিয়োগেরও তিনি খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছেন। এঁর শাসন সুরু হওয়ার সংগে সংগে সিভিলিয়ান মহোদয়দের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। বল্লভভাই প্যাটেলের যেমন কথা, তেমনি কাজ।

পাকিস্তানীদের উদ্দেশে বলেছেন,—

"আপনারা সাফল্যলাভ করিতে পারেন, কিন্তু অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রের প্রতিরোধ করা হইবে! তরবারি বা রক্তপাত দ্বারা পাকিস্তান লাভ হইবে না।"

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারদৌলি সত্যাগ্রহের বীর সেনাপতি সর্দারজী। তাঁর মুখের কথায় গুজরাতী চাষীরা প্রাণ দিতে পারে। ১৯২৮ সাল গুজরাতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় বছর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহাত্মাজী-পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকে তিনি রূপায়িত করে তুললেন। তাঁরই আহ্বানে হাজার হাজার গরীব মানুষ দৃঢ়পণ করে বসল, রাজার খাজনা তারা আর দেবে না। অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ তারা জানাবেই। সমগ্র ভারত বিস্ময়ে চেয়ে দেখল, দীন চাষীরা দুধর্ষ বৃটিশের অত্যাচারের সামনে হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। বল্লভভাই জয়লাভ করলেন—তাঁর যশ দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হ'ল। ১৯৩০ এর আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়েও জননায়ক বল্লভভাইয়ের নেতৃত্বে সারা গুজরাত ও বোম্বাই অভূত-পূর্ব আলোড়ন নিয়ে এলো। শত শত সরকারী কর্মচারী কাজে ইস্তফা দিলেন, হাজার হাজার তরুণ-বৃদ্ধ পুলিশের লাঠি আর গুলির সামনে বুক পেতে দিল। বিদেশীয় সরকার বুঝল, তার এতদিনের গড়া ইমারতের ভিৎ টলে উঠেছে সর্দার বল্লভভাইয়ের মত অদমনীয় নেতাদের নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণায়। এই পরীক্ষায় সিদ্ধকাম হওয়ায় গান্ধীজী নূতন প্রেরণা পেলেন। সর্দারজী হলেন

তাঁর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ। কায়রা সত্যাগ্রহ, নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ প্রভৃতি প্যাটেলের অতুল কীর্তি।

কংগ্রেস যে আজ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে—তার মূলে আছে সর্দারজীর অক্লান্ত প্রয়াস। প্রতিষ্ঠানের বহু দুর্বলতাকে তিনি নির্মম হাতে দূর করেছেন; তাকে বাঁচিয়েছেন শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে। প্রাদেশিক কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্ব যে অপূর্ব সফলতা লাভ করেছিল, তার একমাত্র কারণ সর্দারজীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। কোন দুর্নীতিকে তিনি প্রশ্রয় দেন্ নি। তাঁর মত কঠোর নিয়মতান্ত্রিক না থাকলে আজ কংগ্রেস দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না।

খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিষ্টার বল্লভভাই জীবনের সর্বসুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গান্ধীজীর আহ্বানে,—স্বদেশের মুক্তি-যুদ্ধে। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত কী অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন এই বিরাট পুরুষটি। কারাবাস, অস্বাস্থ্য, বিরুদ্ধবাদীর চক্রান্ত, কোনো কিছুই তাঁর জয়যাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এমন শক্তিমান পুরুষেরই আজ প্রয়োজন। কুচক্রীর দলকে দমন করতে, অসাধুকে শাস্তি দিতে, বিরাট প্রতিষ্ঠানকে নব-পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ভারতে আর কে আছে?

আমেদাবাদের ব্যারিষ্টার বল্লভভাই আফ্রিকা-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার গান্ধীজীর সত্য, অহিংসা, অসহযোগের কথা শুনে

পরিহাস করতেন। এই অস্ত্র নিয়ে বৃটিশের সংগে লড়াই? অথচ কিছুদিন পরেই এই দৃঢ়-চরিত্র মানুষটির জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ বদলে গেল। পরম বিদ্রোহী সত্যাগ্রহের অস্ত্র ধারণ করলেন। তাঁর চরিত্রে আপোষ-রফার স্থান নেই, জন্মবিপ্লবী সর্দার প্যাটেল—পরম আত্ম-বিশ্বাসী।

ধর্ম সম্বন্ধে সর্দারজীর কোনো গোঁড়ামি নেই—তিনি কঠিন বাস্তবপন্থী। তাঁর মত স্বাধীনচেতা লোক কেমন করে গান্ধিজীর নেতৃত্ব মেনে নিলেন, ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। গান্ধীজীর অধ্যাত্ম-বাদের সঙ্গে বল্লভভাই-এর ব্যবহারিক বুদ্ধি মিলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এক অপূর্ব সমন্বয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

সর্দার বল্লভভাই-এর বংশ বীরের বংশ। তাঁর পিতা সিপাহীবিদ্রোহের সময় বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিঠলভাই তাঁর অনমনীয় মনোবৃত্তির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বল্লভভাই-এর সাহস ও শৌর্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। একটি ছোট্ট ঘটনায় তাঁর অদ্ভুত মনের জোরের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যারিষ্টার বল্লভভাই বিচার-কক্ষে দাঁড়িয়ে আসামীর পক্ষ সমর্থন করছিলেন। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলেন, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। পরে টেলিগ্রামের খবর যখন সকলে জানতে পারলেন, তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন সর্দারের চিত্ত-সংযম দেখে। বাংলা দেশের দাঙ্গা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—

মিলিটারী বা পুলিশের সাহায্যের ওপর ভরসা না করে আমাদের নিজের বাহুবল আর মনের বলের ওপর নির্ভর করা উচিত।

কংগ্রেস তোষণ নীতি বর্জন করে আজ বজ্র হুঙ্কারে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। এই নূতন নীতির প্রধান পুরোহিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। বৃদ্ধ বয়সেও তরুণের দীপ্তি তাঁর মুখমণ্ডলে। পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,—

His malady which occasioned his madical release from Yerawada in 1941 has been his companion and his curse but his good cheer enables him to face death with a joke on his lips.

পুরুষসিংহ প্যাটেলের নির্দেশে আজ জাগ্রত জনগণ মুক্তির কণ্টকাকীর্ণ পথে এগিয়ে চলেছে। রণে চির-অক্লান্ত সেনাপতি জয়রথের সারথি হয়ে আমাদের বন্ধন-ভয় দূর করে দিন, এই কামনা করি। সরল গ্রামবাসীদের দুর্ধর্ষ নেতা, শহরবাসীদের পথপ্রদর্শক এই অচল অটল মহাবীরকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এই লম্বা একহারা লোকটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ। একটা বিরাট যন্ত্রকে চালনা করবার জন্য যেমন বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন সুদক্ষ লোকের দরকার হয় তেমনি ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদকের কাজ যিনি বহু বৎসর ধরে করেছেন, তাঁর প্রতিভা সহজেই অনুমেয়। কংগ্রেসের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন এই সাদাসিধে লোকটি। পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াবার কোনোদিনই ইচ্ছা ছিল না তাঁর—লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে দেশের সেবা করে যাবেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু জাতির চরম দুর্দিনে সকলের অনুরোধে এগিয়ে আসতে হলো, কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করতে হলো বিশ্বস্ত নিরলস এই কর্মীপ্রধানকে।

১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেবার সংগে সংগেই আচার্য কৃপালানীর ডাক পড়ল সুদূর নোয়াখালিতে। তিলমাত্র বিলম্ব না করে তিনি পাড়ি দিলেন সেই দুর্গম পথে। নির্মম গুণ্ডাদের রাজত্বে শত বিপদ-বাধাকে তুচ্ছ করে এই সত্যান্বেষী নেতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন আশ্বাসবাণী। তাঁর বজ্রগম্ভীর সাবধানবাণী শুনে অত্যাচারীর হাত কেঁপে উঠল। পাশবিক বর্বরতার কাহিনী জগতের সামনে তিনি উন্মুক্ত করে ধরলেন। সারা ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল দুর্গত নোয়াখালির ওপর। শুধু নিজে গিয়েই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নি, অক্লান্তকর্মী সেবাপরায়ণা স্ত্রী সুচেতা দেবীকে রেখে এলেন হতভাগিনী হিন্দুনারীদের চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য। যোগ্য সহধর্মিণী বাঙালী-মেয়ে শ্রীমতী সুচেতা নোয়াখালির শত্রু-মিত্র সকলকেই আপন করে নিলেন দু'দিনে। নোয়াখালবাসিনীরা তাঁকে "দেবী-মা" বলে ডাকতে লাগল। যে-সব লোমহর্ষণ সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরলেন কৃপালানী, তা পৌঁছল গান্ধীজীর কাছে। মহামানবের বেদনাতুর অন্তর কেঁদে উঠল বাংলার প্রপীড়িত নরনারীর জন্য। সুরু হ'ল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অহিংস-সংগ্রাম। এই মহাপরীক্ষার ইতিহাসে কৃপালানীর আপ্রাণ চেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাঙালী কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করবে তার বিষম দুর্দিনে রাষ্ট্রপতি কৃপালানীর এই সহানুভূতির কথা।

মীরাট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি কৃপালানীর অভিভাষণকে এক কথায় যুগান্তকারী বলা চলে। এমন যুক্তিপূর্ণ, সুসমঞ্জস

ভাবগর্ভ বক্তৃতারই প্রয়োজন ছিল এই সংকটকালে। খুব সুন্দর করে তিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন,—

"সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা একটি মহৎ আদর্শ লইয়া জাতীয় মুক্তিসাধনায় ব্রতী হইয়াছি। বিজাতীয় দাসত্ব হইতে দেশের মুক্তির জন্যই আমরা কেবল সংগ্রাম করিতেছি না। এরূপ সুযোগ ইতিহাসে বহু জাতির হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সুযোগ অনন্যসাধারণ ও অভিনব। অহিংসার শুভ্র পথে আমরা স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। নীতিসম্মত উপায়ে উচ্চাদর্শের জন্য কাজ করার গৌরব আমরা লাভ করিয়াছি। বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী, ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সুযোগ আমরা পাইয়াছি। আপাতদৃশ্যমান বিরোধ ও বিভিন্নতার অপ্রাকৃত ব্যবধান লোপ করিয়া সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটাইবার সুযোগও আমাদের হইয়াছে।... একথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না যে, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সর্বগ্রাসী বিরোধ দেখা দিয়াছে, মানুষ হয় উহার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবে, নতুবা তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হিংসা দ্বারা তাহা সমাধান হইতে পারে না। হিংসা সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছে—ইহা রোগের সহিত রোগীকে বিনাশ করিবার উপক্রম করিয়াছে। অন্য কোনো

উপায় বাহির করিতে হইবে। ভারত সে উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং অসাধারণ শক্তিমানের নেতৃত্বে তাহা প্রয়োগও করিয়াছে। প্রণালীটি অভিনব। ইহাতে অবশ্য ছেদ পড়িয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতীয় বিপ্লবের চেয়ে ইতিহাসের কোনো বিপ্লবে অপেক্ষাকৃত কম ধনপ্রাণহানি বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপর্যয় ঘটে নাই। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয় বিপ্লব আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে সমুপস্থিত। আমাদের প্রচেষ্টা অবিলম্বে জয়যুক্ত হোক্ আর না হোক্, আমরা যে শুভ ও মহৎ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিতেছি, তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। কখনই এই আদর্শের পরিণতি—ব্যর্থতা হইতে পারে না। তবে সাফল্য অর্জন আমাদের অভিপ্রেত হইলে, যাহারা উহার জন্য কাজ করিতেছে, তাহাদিগকে সৎ ও মহৎ হইতে হইবে। আলোকশিখা উদ্ভাসিত হইলেই শতাব্দীর অন্ধকার বিলীন হইবে। ভারতে আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে। অনির্বাণ আলোকবর্তিকা লইয়া চলুন আমরা অগ্রসর হই, তখন সকলেই আমাদের সহিত মিলিত হইবে। বন্দে মাতরম্!"

এই অভিভাষণে আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা আর সাফল্যের অদম্য আশাই প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির এই ল্যাণাকাঙ্খার সংগে দেশবাসীর ঐকান্তিক কামনা মিলিত হোক্, আমাদের এইটুকুই আন্তরিক অভিলাষ।

ছাত্রজীবনে জীবৎরাম ইংরেজ অধ্যক্ষের নিন্দনীয় আচরণের প্রতিবাদে ধর্মঘটের ব্যবস্থা করেছিলেন। অধ্যাপক-জীবনে বিপ্লবীদের সংগে মেলামেশা করার অজুহাতে সরকার একবার তাঁকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেন। স্বাধীনচেতা পরিবারে তাঁর জন্ম। জন্ম থেকেই কৃপালানী চির-বিদ্রোহী।

বিহারে অধ্যাপকের কাজ করবার সময় কৃপালানী মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজী তাঁকে সংগী করে নেন। কংগ্রেস-পরিচালকদের মধ্যে কৃপালানীই বোধ হয় গান্ধীজীর সবচেয়ে পুরানো শিষ্য। গান্ধীবাদ সম্পর্কে তাঁর বইগুলি প্রামাণ্য। অথচ ইনিই ছাত্রজীবনে সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশতেন—সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনাই তাঁর তরুণ মনকে অধিকার করে থাকত। সেই কৃপালানী কাশীর পথে পথে খদ্দর প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন—গঠনমূলক কর্ম্মপন্থাই হ'ল তাঁর জীবনাদর্শ। জীবনের সব কিছু আরাম, সুখ বর্জন করে তিনি ঝাঁপ দিলেন দেশমাতৃকার সেবায়। এই সরল অথচ বুদ্ধিমান, অহিংস অথচ তেজোদৃপ্ত, পণ্ডিত অথচ পরিহাসকুশলী নেতা সকলেরই আজ শ্রদ্ধাভাজন। সব প্রদেশেই তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। অহিংস উপায়ের সার্থকতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"একথা বলিতে আমি দ্বিধাবোধ করি না যে, পূর্বে আমি হিংস পন্থায় বিশ্বাস করিতাম এবং ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেও

আমি সাহসী ছিলাম বলিয়াই মনে করি এবং ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিতেও হয়ত আমি দ্বিধাবোধ করিতাম না। কিন্তু গান্ধীজীর নিকট হইতে অহিংস মতবাদ গ্রহণ করিবার পর হইতে আমি নিজেকে যেরূপ নির্ভীক, যেরূপ সাহসী ও শক্তিশালী বলিয়া মনে করি, পূর্বে কখনও তেমনি করি নাই।"

আচার্য কৃপালানীর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে অনেক তার্কিককেই পরাভূত হ'তে হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীকে হাস্যপরিহাস দিয়ে হারিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর মন্তব্য সময় সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হ'লেও তার মধ্যে দরদী প্রাণের স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায়। খুব গম্ভীর বিষয়ের মধ্যেও রসের অবতারণা অত্যন্ত সহজেই করতে পারেন কৃপালানীজী। ছাত্র এবং বন্ধুমহলে তিনি কতখানি প্রিয় তা বলে বোঝানো যায় না। শ্রদ্ধাভরে অনেকেই তাঁকে "দাদা" বলে ডাকে। বাইরে কঠোর অথচ অন্তরে কোমল এই লোকটির মধ্যে মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা লুকিয়ে আছে। যা কিছু অসত্য, অন্যায়, তার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন। একবার যা সত্যপথ বলে বুঝেছেন, কোনোদিন কোনো প্রলোভনে পড়ে তা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হ'ন নি। যখনই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতি-পদ ত্যাগ করতেও ইতস্ততঃ করেন নি। গরীবের মত তাঁর বেশভূষা, জীবনযাত্রা,—অহিংস বিপ্লব তাঁর আদর্শ, তিনি

বক্তৃতার চেয়ে কাজকে সম্মান করেন বেশী, দুঃখী অথচ তেজোদৃপ্ত ভারতবর্ষের প্রতীক তিনি।

যখন তিনি রাষ্ট্রপতি তখনও নিজের হাতে কাপড় কাচতে বা বাসন মাজতে দ্বিধাবোধ করেন নি। রান্নাবান্নাতেও তিনি সমান পারদর্শী। আহমদ্‌নগর দুর্গে বন্দী থাকার সময় নেতাদের রসনা পরিতৃপ্ত করবার ভার ছিল তাঁর ওপর। নিজেই সূতা কেটে নিজের কাপড়-জামা তৈরী করেন। তাঁর মোটরগাড়ী নেই—বাড়ীর আসবাবপত্রও অকিঞ্চিৎকর! আমাদের গৌরবের কথা, বাঙলার বিদুষী মেয়ে সুচেতা এমন মহৎ-প্রাণ মানুষকে স্বামীরূপে লাভ করেছেন! আর কৃপালানীর কাছেও এই ব্রতচারিণীর সাহচর্য অমূল্য সম্পদ্‌। এঁদের অতিথেয়তার কথা ভারত-বিদিত। সকলের জন্যই এঁদের গৃহদ্বার উন্মুক্ত। দেশী-বিদেশী কত লোকই না কৃপালানী-দম্পতির চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন!

আচার্য কৃপালানীর স্বাস্থ্য কোনোদিনই খুব ভাল নয়। কিন্তু কী কঠোর পরিশ্রম করবার শক্তি তাঁর! ১২ বছর ধরে কংগ্রেস-সম্পাদকের কাজ করা কতখানি কঠিন তা কল্পনার বাইরে। কত রকম বিচিত্র মতের মানুষকে নিয়ে কারবার করতে হয়েছে তাঁকে; কত বাধা-বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়েছে তাঁর চলার পথে; তবু নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন এই বীর সৈনিক। মহাত্মাজীর আশীর্বাদ-অভিষিক্ত এই কংগ্রেস-নেতার জীবন কর্ম আর সেবায় ভরপূর। বাংলা দেশের

বড় দুর্দিনে ইনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পাশে। আমরা যখন অত্যাচারে, অপমানে, হতাশায় ম্রিয়মান তখন এই আচার্য কৃপালানী বহে এনেছিলেন আশার আলোকবর্তিকা। আমরা যখন ভয়-বিমূঢ় হয়ে কাপুরুষের মত জীবন যাপন করছিলাম, তখন কৃপালানীজী বজ্রকণ্ঠে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, রাজেন্দ্রলাল রায়ের বীরত্বের কথা। বল্লেন—তাঁর মত জীবনপণ করে নারীর সম্মান রক্ষা করতে হ'বে। দুর্বৃত্তের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে গিয়ে প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করব না। আত্মরক্ষা বীরের ধর্ম।

নির্যাতীত ম্রিয়মান বাংলার বুকে সিন্ধুদেশের এই মানুষটি এসে সেদিন জীয়নকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্য রাষ্ট্রপতি কৃপালানী শুধু বাংলার কাছে নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পর আদর্শ কর্মীর আজ একান্ত অভাব, আচার্য কৃপালানী সেইজন্যই রাষ্ট্রপতির পদাধিকার গৌরব ত্যাগ করে নেবে এসেছেন জনসাধারণের মাঝে কাজ করতে। ভারতকে কলুষমুক্ত করে জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে গান্ধীজীর আদর্শকে তিনি সার্থক করে তুলুন, ভগবানের কাছে ইহাই আজ আমরা প্রার্থনা করি।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

বর্তমান ভারতের মুসলমান-সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বল্‌বেন,—মৌলানা আজাদ। অবশ্য বিকৃতমস্তিষ্কেরা এ কথা স্বীকার না-ও করতে পারে। পাণ্ডিত্যে আত্মত্যাগে, বাগ্মিতার শক্তিতে, দুঃখবরণের ক্ষমতায়, ব্যক্তিত্বে, এই মানুষটির তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু এদেশে নয়, তাঁর খ্যাতি জগতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। আরব, মিশর, তুরস্ক সকল জায়গাতেই তাঁর সমান আদর। সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন মৌলানা সাহেব। বিশ্বব্যাপী মহাসংকটের কালে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনি ভারতের জয়রথের সারথি ছিলেন। সৌম্যমূর্তি, নম্র, অথচ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এই নেতার নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৮৮৮ সালে মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর যখন ৮ বছর বয়স তখনই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ৪ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ বছরের পাঠ শেষ ক'রে তিনি সবাইকে চমৎকৃত করেছিলেন। কবি হালি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'তরুণের দেহে বৃদ্ধের মাথা!' ইস্‌লাম শাস্ত্রে তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞান আর কারু নেই। তাঁর কোরাণের ভাষ্য জগদ্বিখ্যাত। এই প্রতিভাবান্ মনীষী মাত্র ১৪ বছর বয়সে সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করে যশস্বী হয়েছেন। ২৪ বছর বয়সে তিনি "আল্ হিলাল" প্রকাশ করেন। এর প্রভাব যুগান্তকারী। মুস্লিম-জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর লেখার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁর ওপর সরকারী নির্যাতন সুরু হল। বিদ্রোহী আজাদ খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯২৩ সালে দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে দেশবাসী মৌলানা আজাদকে কংগ্রেস-সভাপতির পদে বরণ করলেন। ১৯৪০ সালে প্রদত্ত তাঁর রামগড় কংগ্রেসের অভিভাষণ এক অমূল্য সম্পদ।

আজকের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিনে, দুই-জাতি মতবাদের ঘৃণ্য প্রচারের পটভূমিকায় আমরা এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান নেতার সেই অমর বাণী স্মরণ করি। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন,

"If Hinduism has been the religion of

the people here for several thousands of years, Islam also has been their religion for a thousand years. Just as a Hindu can say with pride that he is an Indian and follows Hinduism, so also we can say with equal pride that we are Indians and follow Islam. I shall enlarge this orbit still further. The Indian Christian is equally entitled to say with pride that he is an Indian and is following a religion of India, namely Christianity.

আজাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনা সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অহিংস বিপ্লবের সমর্থক হলেও তিনি যোদ্ধার ধর্মকে অস্বীকার করেন না। ভারতকে বীরত্বে দীক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। বাংলার বিপ্লববাদের সংগেও আগে তাঁর যোগ ছিল। তা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ সর্বজনবিদিত। ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি উর্দু, হিন্দী বা বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত। প্রাচ্য সংস্কৃতির যা কিছু গুণ সবই তাঁর মধ্যে বর্তমান। দীর্ঘ দিন অসুস্থতা ভোগ করে আজও তাঁর কর্মক্ষমতা অসীম। দেশবন্ধু আর আলি ভাইদের একদিন তিনি যেমন প্রাণ দিয়ে সাহায্য করতেন, আজ গান্ধীজী আর

কংগ্রেসের আদর্শকে তিনি তেমনি ভাবেই জয়যুক্ত করবার জন্য প্রাণপাত করছেন।

শ্রীমতী নাইডুর মত আলাপ-আলোচনা করার অদ্ভুত ক্ষমতা মৌলানা আজাদের। ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, ভ্রমণকাহিনী সব বিষয়েই তাঁর আলোচনার ভংগী অপূর্ব। বাংলা, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, সমরখন্দ, ইরাণ, ইরাক্, মিশর, গ্রীস, ইটালী, প্যারী সব জায়গার কথাই তিনি সরস করে বলতে পারেন। এমন সর্বতোমুখী প্রতিভা যাঁর, তাকে "কমলা বক্তৃতা" দেবার জন্য আহ্বান করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই কৃতার্থ হয়েছে। রাজনৈতিক বিতর্কে তাঁর কতখানি ক্ষমতা তার পরিচয় সরকারী মহল পেয়েছিলেন সিমলা সম্মেলনের সময়।

একদিকে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক, অন্যদিকে মুস্লিম সাধক—এই অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মৌলানার চরিত্রে। তিনি শুধু যে ভারতের রাষ্ট্রনীতি বা ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন তা নয়, সুদূর মিশর এবং আফগানিস্তানের ইতিহাসেও তাঁর লেখনীপ্রভাবে যুগান্তর ঘটেছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও মৌলানার অসাধারণ জ্ঞান। পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্পর্কে তিনি যে কত পড়াশোনা করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর লাইব্রেরী দেখবার জিনিষ। বিখ্যাত নূতন ও পুরাতন বইয়ের সমাবেশ সেখানে। প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য আরবী পুস্তক থেকে ইংরাজ কবিদের কাব্যগ্রন্থ—কোনো কিছুরই অভাব নেই। John Gunther তাঁকে "bookworm intellectual and

savant" বলে অভিহিত করেছেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি ভারতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান কংগ্রেস সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এই অতুলনীয় কীর্তি তাঁর মহৎ চরিত্রের সাক্ষ্য দেয়। মহাত্মাজী এবং পণ্ডিতজী দু'জনেই তাঁর পরামর্শের ওপর নির্ভর করেন। শ্রীমতী নাইডুর মতই তাঁর অসাধারণ বাগ্মীপ্রতিভা। প্রাচ্য সংগীতের তিনি একজন মস্তবড় সমঝ্‌দার।

মনীষার সংগে সংগঠন-শক্তির, পাণ্ডিত্যের সংগে সরল জীবনের, বীরত্বের সংগে আত্মত্যাগের, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার সংগে ভাবীকালের স্বপ্নের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির অপরূপ সমন্বয় আমরা দেখতে পাই এই জননায়কের জীবনে। আহম্মদ-নগর দুর্গে বন্দী থাকার সময় বেগম আজাদের বিচ্ছেদ, অসুস্থ শরীরে অমানুষিক পরিশ্রম, হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের সাময়িক বিফলতা এই আশাবাদী নেতার মনে হতাশা আন্‌তে পারেনি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এগিয়ে চলেছেন স্বাধীনতার দুর্গমপথে; মস্তকে অতুলনীয় জ্ঞান, অন্তরে নিপীড়িত জনগণের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি, হাতে জাতীয় নিশান, চোখের সাম্‌নে মুক্ত ভারতের প্রতিচ্ছবি, কণ্ঠে উদার আহ্বান! সেই ডাক কি আমাদের প্রাণে পৌঁছবে না?

আব্দুল গফর খাঁ

প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা প্রশস্ত-বক্ষ এই পাঠানকে দেখলে মনে হয় কী অমানুষিক শক্তি এই দেহে! কিন্তু যখন আমরা তাঁর মনের পরিচয় পাই তখন বুঝি, দেহের চেয়ে কত শতগুণ বেশি জোর এই সরলপ্রাণ পাঠানের অন্তরে। বাহুবলই যে জাতির প্রধান সম্বল, সেই জাতির জীবনে এই মানুষটি অপূর্ব রূপান্তর এনে দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার অহিংসাকে জীবনের মূল মন্ত্র বলে মেনে নিয়ে কী অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়েছে! যারা প্রাণের বদলে প্রাণ নিত, তারা বুক পেতে গুলি খেয়ে মরেছে। সীমান্তের উপজাতিরা জগতের সামনে সত্য আর পবিত্রতার আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের অবিসংবাদী নেতা বলেন,—

"আমি খোদার সেবকমাত্র। আমি খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার। এই দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে গিয়ে কাজ করাতেই আমি বিশ্বাস করি!"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আব্‌দুল গফর খাঁর জন্ম হয়। মিশন স্কুলে তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় হাতে-খড়ি হল। তরুণ বয়সে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোক্‌বার পর তিনি মৌলানা আজাদের উদ্দীপনাময়ী লেখার দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'ন। প্রথম জীবনে সৈন্যদলে যোগ দেবার প্রবল বাসনা থাকলেও শ্বেতাংগ-দের হাতে ভারতীয়ের লাঞ্ছনা লক্ষ্য করে তাঁর মতের আমূল পরিবর্তন হয়। গ্রামে গ্রামে তিনি শিক্ষা-প্রচার সুরু করলেন। নানা জায়গায় তাঁর নেতৃত্বে তরুণদের দল গড়ে উঠ্‌ল। সীমান্ত-সরকার গফর খাঁর প্রভাব দেখে বিচলিত ও শংকিত হলেন। পুত্রের অপরাধে নব্বুই বছরের বৃদ্ধ পিতাকেও তাঁরা বন্দী করলেন। সীমান্ত-গান্ধীর দাদা ডাঃ খাঁ সাহেব তখন য়ুরোপে।

১৯১৯ সালে মুক্তির পর পাঠানেরা গফর খাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ "বাদশা খাঁ" উপাধি দিল। তিনি হলেন সমগ্র পাঠানজাতির অন্তরের রাজা। বাদশা খাঁ দু-তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও সে পদ প্রত্যাখ্যান করেছেন সবিনয়ে। নীরবে সুদূর গ্রামাঞ্চলে গঠনমূলক কর্ম করাই তাঁর জীবনের আদর্শ। অহিংস সংগ্রামে বরাবরই জয়ী হয়েছেন সীমান্ত-গান্ধী। অহিংসা তাঁর ভাব-বিলাস নয়,

জীবনে অহিংসা-মন্ত্রের সাফল্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছেন—

'My non-violence has almost become a matter of faith with me. I believed in Mahatma Gandhi's Ahimsa before. But the unparalleled success of the experiment in my province has made me a confirmed champion of non-violence......We have an abundance of violence in our nature. It is good in our interests to take a training in non-violence. Moreover, is not the Pathan amenable only to love and reason? He will go with you to hell if you can win his heart, but you cannot force him to go to heaven.'

এবার পণ্ডিত নেহেরু যখন সীমান্ত-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন উপজাতিদের মধ্যে কিছু অংশ লীগ-পন্থীদের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে নেহেরুকে আঘাত করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। আব্দুল গফর খাঁ ও প্রধান মন্ত্রী খাঁ সাহেব তাঁদের সম্মানীয় অতিথি—জাতীয় নেতাকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। সীমান্ত গান্ধীর হাতের আঙ্গুল ভেংগে গিয়েছিল। তবু তিনি বা তাঁর অনুচরেরা অহিংসা-মন্ত্রের কথা ভুলে যাননি।

এমন অপূর্ব আত্ম-সংযম জগতের ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। শত অন্যায় অত্যাচার আব্দুল গফর খাঁর অন্তরের স্থৈর্যকে নষ্ট করতে পারেনি। কত কঠিন পরীক্ষায় তিনি কত সহজে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কারাগারে শোষক সরকার তাঁকে হাতে-পায়ে বেড়ী দিয়ে, গলায় লোহার হাঁসুলি ঝুলিয়ে, নাম-মাত্র জামাকাপড় পরিয়ে রেখে দিয়েছে; তাঁকে দিয়ে প্রতিদিন প্রায় আধমণ ডাল ভাঙ্গিয়েছে। এমন কি একবার ছোট লোহার বেড়ী জোর করে তাঁর পায়ে পরিয়ে দেওয়ায় তিনি সাংঘাতিকভাবে জখম হন। তবু কোনোদিন এই অজেয় পাঠান বীর আদর্শচ্যুত হন নি।

ভারতে হিন্দু-মুস্লিম দ্বন্দ্বের জন্য যে বৃটিশই দায়ী, একথা তিনি বার বার বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন। ভণ্ড ইংরাজের মুখোস খুলে তিনি তাদের যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করেছেন। সরকারী রাজনৈতিক বিভাগের ষড়যন্ত্রের তিনি যে রকম কঠোর সমালোচনা করেছেন, তাতে সারাদেশে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। এই মানুষটি কোনোদিন ইংরাজের সংগে রফা করতে প্রস্তুত হননি। ইংরাজের সংগে বিগত যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রস্তাবেরও তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। তা ছাড়া তাদের সংগে কোনো বিষয়েই আলোচনা চালাতেও তিনি রাজী নন। আব্দুল গফর খাঁর একমাত্র দাবী—বৃটিশ, ভারত ত্যাগ কর!

খুদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দলের প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করলে আমরা

বুঝতে পারি, সীমান্ত-গান্ধীর চরিত্রের ঐশ্বর্য কোন্‌খানে। কয়েকটি প্রতিজ্ঞা এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাঃ মাতৃভূমির জন্য আমি আমার সুখ, ঐশ্বর্য ও জীবন উৎসর্গ করবো।

ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞা ঃ আমি সর্বদা অহিংসার পথ অনুসরণ করে চলবো।

সপ্তম প্রতিজ্ঞাঃ আমি মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করবো এবং আমার দেশ ও ধর্মের মুক্তিসাধন করাই আমার লক্ষ্য হবে।

নবম প্রতিজ্ঞাঃ আমি খোদার নামে যে কাজ করবো কখনই তার জন্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করবো না।

বাদশা খাঁ বলেন,—

"আমি পাঠানদের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সংগঠন করিতে চাই এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া এমন এক জাতি গঠন করিতে চাই, যে জাতি দেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।"...

এই খুদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। নিয়মনিষ্ঠ লাল-কোর্তারা স্বেচ্ছাসেবকের এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন দেশের সাম্‌নে।

১৯৩৩ সালের ২৩শে এপ্রিল পেশোয়ারের রাজপথে সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্ত সত্যাগ্রহীদের ওপর সৈন্যরা নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। নির্ভীক পাঠান রক্ততিলক ললাটে পরে

নিঃশংকচিত্তে প্রাণ দান করেছিল। গাড়োয়ালী সৈন্যরা নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করায় তাদের কোর্ট-মার্শালের শাস্তি হয়। গফর খাঁর আত্মিক বল পশু-বলকে পরাস্ত করে। এই দিনটি সীমান্তবাসীদের স্মরণীয় দিন। এই সব 'ভক্তদেহের রক্তলহরী' বৃটিশ শাসনের মুখে চিরদিনের মত কলংক-কালিমা লেপে দিয়েছে। আর পাঠানজাতি লাভ করেছে নবজন্ম তাদের প্রিয়তম ফকির-ই-আফগানের প্রেরণায়। নৃশংস সৈন্যরা শিশুদের হত্যা করেছে, পুরনারীর অপমান করেছে, খুদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে; তবু অনমনীয় সীমান্ত-গান্ধী আর তাঁর অজেয় দল শত অপমানের ঊর্ধে মাথা উন্নত করে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে বলেছে, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

দুর্ধর্ষ পাঠানদের এই অধিনায়কের চিত্ত কিন্তু শিশুর মত কোমল। মানবের প্রতি করুণায় তাঁর অন্তর অভিষিক্ত। গ্রামের সাধারণ লোকের মাঝে তাঁর প্রদীপ্ত চেহারা ছাড়া বোঝবার উপায় থাকে না যে, তিনি বিখ্যাত পুরুষ। ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই মানুষটির সংগ তাই পাঠানদের কাছে বড়ই কাম্য। তাদের নেতার এক কথায় তারা হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে, আবার পিতৃতুল্য গফর খাঁর কাছে তাঁর পাঠান সন্তানেরা প্রাণের চেয়েও প্রিয়। একতিলও অহংকার নেই তাঁর মনে। কিছুদিন আগে তাঁর স্বাক্ষর চেয়ে বলেছিলাম,—

"আপনার হাতের স্পর্শ আমার খাতায় থাকলে জীবনে অনেক প্রেরণা পাব।"

হাসিমুখে সই করে দিলেন বটে, কিন্তু আমার বুকে হাত রেখে বল্‌লেন,—"অপ্‌নে অপ্‌নেকো মাদাৎ দেও!" অর্থাৎ নিজেই নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হ'বে, অন্যের সাহায্য নিয়ে নয়। মহামানবের এই অমূল্য উপদেশটি কি ভোলবার?

যে মুসলমান মনীষীরা ভারতে জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন, আব্দুল গফর খাঁ তাঁদের অন্যতম। মৌলানা আজাদ ছাড়া আর কোন মুসলমান নেতা জনগণের এতখানি শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি। জিন্নার জনপ্রিয়তা, ভয় ও স্বার্থবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর সীমান্ত-গান্ধী হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণের চেয়েও প্রিয় পথপ্রদর্শক। 'পাকিস্তানে'র অসারতা বার বার তিনি সপ্রমাণ করেছেন। নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় মুসলীম-লীগের শোচনীয় পরাজয় আব্দুল গফর খাঁর আদর্শের জয়ের পরম নিদর্শন।

বাদ্‌শা খাঁ সীমান্তবাসীদের ডেকে বলেছেন:

> 'পর-শাসন স্বীকার করিয়া লওয়া অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরহস্তক্ষেপ বা পর-আক্রমণ হইতে আমাদের স্বদেশভূমিকে মুক্ত রাখিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প থাকিব। আমরা আর দাস-জীবন বরদাস্ত করিব না। এই অবস্থা স্বীকার

করিয়া লওয়াও পাপ। যদি তোমরা শান্তি চাও, খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে উঠ, জাগ ; আর না-হয় চিরতরে অধঃপতনের অতলতলে তলাইয়া যাও।"

আগষ্ট আন্দোলনের সময় পাঠানেরা গফর খাঁর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। গান্ধীজীর আদর্শকে তারা পূর্ণতা দিল 'অহিংসা বীরের হাতেরই অস্ত্র—ভীরুর নয়।'

বাংলা দেশের প্রতি তিনি বাণী দিয়ে গেছেন—

"এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবার মধ্যেই আমি স্বাধীনতার আলোকরশ্মি দেখিতে পাইতেছি। বাংলার অধিবাসিগণের নিকটে আমার সেবার বাণীই আমি রাখিয়া যাইতেছি। আমার দরিদ্রসেবার ব্রতই সে গ্রহণ করুক এবং গ্রামে গ্রামে গিয়া কর্তব্য সম্পাদন করুক।……সকলের মধ্যে প্রকৃত ও অপকট ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে কিছুই লাভ হইবে না।"

সহসা মনে হয় এই বাণী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের। ধর্মজগতে স্বামীজীর যা স্থান, রাজনৈতিক গগনে আব্দুল গফর খাঁও তেমনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি তিনি। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক!

দেশরত্ন রাজেন্দ্রপ্রসাদ সারা বিহার প্রদেশের প্রতিমূর্তি। তাঁকে আর তাঁর প্রদেশকে আলাদা করে ভাবা যায় না। চেহারায়, কথাবার্তায়, জীবনযাত্রায় সাধারণ এক বিহারী থেকে তাঁকে পৃথক করা শক্ত। অথচ এত বড় পণ্ডিত শুধু এদেশে কেন, অন্য দেশেও দুর্লভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আইনে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। তার লেখা India Divided প্রমুখ বইগুলি জাতীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান। আর সেবার দিক্ দিয়ে তার তুলনাই হয় না। বিহার ভূমিকম্পের সময় তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও দরদী প্রাণের পরিচয় পেয়ে সকলে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ভাণ্ডারে ২৮ লাখ টাকা সঞ্চিত হয়েছিল। কোয়েটা ভূমিকম্প সমিতিরও তিনি ছিলেন সভাপতি। অথচ হাঁপানী প্রভৃতি নানা রোগ বহুকাল থেকে তাকে রুগ্ন করে রেখেছে।

এমন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও কী তাঁর উদ্যম, দেশমাতৃকার সেবায় কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী ছিলেন তিনি। দেশের চরম দুর্দিনে যোগ্যতম লোকের হাতে এই বিভাগের ভার পড়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এমন সুন্দরভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তা'তে বড়লাট ও য়ুরোপীয়ান দল সকলেই অবাক্ হয়ে গিয়েছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেকে একজন চাষী বলেই মনে করেন। তাই চাষ এবং চাষীদের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। তাঁর "দেশরত্ন" উপাধি তাঁর দেশপ্রীতির পরিচায়ক।

১৮৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয় বিহারের সারণ জেলায়। সকলেই আশা করেছিলেন তাঁর মত মেধাবী ছাত্র বড় উকীল হয়ে পশার জমাবেন। কিন্তু তিনি মেতে উঠ্লেন যুব-আন্দোলন আর ছাত্র-সংগঠনে। চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজীর সহকারী হলেন। বিহার তাঁর মধ্যে খুঁজে পেল তার সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ককে। গান্ধীজী তাঁর আত্ম-কথায় এই দেশকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংগে সংগে তাঁর জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। কোথায় রইল রাশি রাশি টাকা রোজগার—দীনবেশে নগ্নপদে তিনি এসে দাঁড়ালেন চাষী-মজুরদের মাঝখানে।

১৯৩৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সাধারণ সম্পাদক ও কার্যকরী-সমিতির

সঙ্ঘের কাজও তিনি অনেকবার করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও আচার্য কৃপালানীর পদত্যাগের পরও তাঁকে কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হয়। বোম্বাই-অধিবেশনে তাঁর উদ্দীপ্ত অভিভাষণ আজ আমরা আবার স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন :

"Independence means the end of exploitation of one country by another and of one part of same country by another part. It contemplates a free and friendly association with other nations for the mutual benefit of all. It forbodes evil to none, not even to those exploiting us except in so far as they rely upon exploitation rather than goodwill. The sanction behind this independence-movement is non-violence which in its positive and dynamic aspect is goodwill of and for all·········Our weapons are unique and the world is watching the progress of great experiment with interest and high expectation. Let us be true to our creed and firm in our determination. Satyagraha in its active application may meet with

temporary set-back but it know no defeat.

হিন্দী রচনাতেও রাজেন্দ্রপ্রসাদের অসামান্য খ্যাতি। নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের তিনি দু'বার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিহাসে তাঁর মত পাণ্ডিত্য খুব কম লোকেরই আছে। তা ছাড়া গঠনমূলক কংগ্রেস-কর্মে তাঁর প্রতিভা সর্বজনবিদিত। খাদিপ্রচার, গ্রামশিল্পোন্নয়ন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, নানাব্যাপারে তাঁর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শক্তি অসীম। শিক্ষাপ্রচারেও তাঁর দান বড় কম নয়। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিহার বিদ্যাপীঠের তিনি সর্বময় কর্তা ছিলেন। গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও তাঁর অসীম অনুরাগ। বিহার ছিল গরীব আর অশিক্ষিতের দেশ। আজ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বিহার ভারতের সকল প্রদেশের শীর্ষস্থানীয়। আত্মত্যাগে, জ্ঞানে, সেবায়, দেশপ্রীতিতে বিহারবাসীরা সকলের আদর্শ। বর্তমান বিহার মন্ত্রিমণ্ডলীর সুনাম বহুদূরপ্রসারী। এই গৌরবের জন্য রাজেন্দ্রবাবু ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অহিংসা মন্ত্রের পূজারী এই নেতাকে শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও অত্যাচারীর হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। অষ্ট্রিয়ার এক সভায় তিনি যখন অহিংস সংগ্রামের ব্যাখ্যা করছিলেন, শান্তি-বিরোধী দলরা এসে সেই সভা ভেঙ্গে দেয় এবং তাঁকে এমন আঘাত করে যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুস্থ হ'তে

অনেক দিন সময় লেগেছিল। অসুস্থ শরীরে দীর্ঘ কারাবাসও তাঁর জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে থেকেও যদি কোনো নেতার কোনো শত্রু না থাকে—তবে তিনি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই নম্র, মৃদুভাষী, ধর্ম্মপ্রাণ নেতাকে ভালবাসে না হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বোধহয় এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। পল্লীভারত, দুঃখীভারতের প্রতীক তিনি। তাঁর হাতে আশার প্রদীপ, অন্তরে বিশ্বাসের পাথেয়, আর কণ্ঠে মুক্তির বজ্রবাণী। ৭টি বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা লাভ করলেও তিনি যখন স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে দেন অগণিত জনগণের কাছে, তারা তা সহজেই বুঝতে পারে—তাদের সংগে আত্মীয়তার নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়। ইস্‌লাম শাস্ত্র-সম্পর্কে তাঁর যা জ্ঞান, খুব কম মুসলমানেরই তা আছে। আর তাদের উর্দ্দু, ফার্সী ভাষা তাঁর কণ্ঠাগ্রে। বিহারের প্রপীড়িত মুসলমানদের রক্ষার জন্য তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছেন। তারা এই নেতাকে তাদের আপনজন বলেই জানে।

সরল অথচ তীক্ষ্ণধী, নম্র অথচ তেজীয়ান্ সর্বত্যাগী এই তাপস আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শত শত লোক বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। বিহারের আগস্ট আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজহাতে বিহারকে এই বীরমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন বলেই সেই প্রদেশ এতখানি সফলতা

লাভ কর্‌তে পেরেছিল। সেনাপতি গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তিনি। নিজ জীবনে তিনি অহিংসার মহান্ আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা দেশবাসীর হৃদয়ও সেই পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে গেছে। এইটিই বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি।

অনেকের ধারণা, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙালী-বিদ্বেষী। এই ধারণা যে কত ভুল—তা সপ্রমাণ করবেন রাজেন্দ্র বাবুর অসংখ্য বাঙালী বন্ধুরা। তাঁর ছাত্রজীবন কল্‌কাতাতেই কেটেছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজ য়ুনিয়নের সভাপতি হওয়া একজন বিহারী ছাত্রের পক্ষে দুর্লভ সুযোগ এবং পরম গৌরবের কথা। অপরিচিত, সাদা-সিধা বিহারী ছেলেটি যখন বিপুল ভোটাধিক্যে এই পদ অলংকৃত করলেন, তখন শিক্ষকরা পর্যন্ত অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন অবাঙালীর প্রতি বাঙালী ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন দেখে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজের চরিত্র-গুণে চিত্তজয়ের যাদুমন্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন।

ভারতীয় গণ-পরিষদের প্রথম সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। দেশের বিশ্বস্ততম সেবককে জাতি চরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে এই মনোনয়নে। তিনি যেরকম সুষ্ঠুভাবে পরিষদের কার্য পরিচালনা করেছেন তা অনুধাবন করলে বিস্মিত হতে হয়। ভারতের পুণ্যতম মহাত্মা বুদ্ধদেবের সঙ্গে বিহারের নানা জায়গার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আজ সেই দেশের একজন নেতা জাতির মুক্তি-তরণীকে শুভলক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলেছেন। এই জয়যাত্রা নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করবে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

বর্তমান যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ রমণী কে? সকলেই একবাক্যে বল্‌বেন, বাংলার মেয়ে শ্রীমতী সরোজিনী। পাণ্ডিত্যে, বাগ্মিতায়, দেশের জন্য আত্মত্যাগে, সংগঠন-কুশলতায় তিনি মহীয়সী মহিলারূপে সুপরিচিতা। তাঁর কবি-প্রতিভা সারা জগৎকে মুগ্ধ করেছে। বিদেশী সমালোচকদের স্তুতি তিনি যতখানি পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো ভাগ্যে বোধহয় ততখানি জোটেনি। ইংরাজী, উর্দূ, হিন্দী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার ওপর তাঁর অদ্ভুত দখলের কথা সর্বজনবিদিত। ১৯২৫ সালে কানপুরে তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমতীই এই গৌরবের অধিকারিণী হয়েছেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় এই তেজস্বিনী রমণীর নেতৃত্বে যখন সত্যাগ্রহীরা ধরসনায় লবণ-আইন ভংগের অভিযান

সুরু করেছিল তখন সারা ভারতে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। পুলিশের শত অত্যাচারকে উপেক্ষা করে এই বিজয়িনী নারী ভারত-ইতিহাসের অক্ষয় অধ্যায় রচনা করেছিলেন। মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সরোজিনীর বীরত্বের ও সেবার কত কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

১৮৭৯ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সরোজিনীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মানী ও য়ুরোপের নানা জায়গায় সুপরিচিত। কবি হারীন্দ্রনাথেরও আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। বোন সুনলিনী একজন উঁচুদরের শিল্পী। সরোজিনী বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্না। তাঁর কবিপ্রতিভা অল্পবয়সেই ফুটে উঠেছিল। পরে তিনি নানা-দেশ ভ্রমণ করে সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর বক্তৃতার ফলে আমেরিকায় ভারত-প্রীতির সঞ্চার হয়। পণ্ডিত জওহরলালের মত সরোজিনী দেবীও সর্বদেশের সর্বজাতির প্রিয়। অথচ খাঁটি ভারতীয় আদর্শে তাঁর জীবন সুনিয়ন্ত্রিত। ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—

> "The true mission of Indian womanhood has been and ever will be to keep alive the hearth fires, the altar fires and the beacon fires of the nation."

দেশমাতৃকার বন্ধন-দশা কবি-প্রাণে বিক্ষোভের ঢেউ তুলল।

মধুর ছন্দ গেঁথে কাব্য-বিলাস নিয়ে এই দরদী প্রাণ ভারত থেকে আর দূরে সরে থাকতে পারলেন না। পরাধীনতার জ্বালা তাঁর মর্মমূল বিদ্ধ করল। অবলা নারীজাতির কলংকমোচন করে অভিজাত-বংশীয়া সরোজিনী সংগ্রামিকার বেশে জনসমুদ্রের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। প্রাচুর্যের মধ্যে লালিতা এই নারী কবিগুরুর সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠলেন—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা !

নতুন পথে সুরু হ'ল তাঁর জীবনযাত্রা ; বাঁশী ছেড়ে অসি ধরলেন হাতে। রাজপথ ছেড়ে কণ্টকাকীর্ণ বিপদসংকুল পথে পা বাড়ালেন। শাসকের ভ্রূকুটি, কারাপ্রাচীরের অন্তরাল, নিপীড়নজনিত ভগ্নস্বাস্থ্য—এই হ'ল তাঁর নিত্য সংগী। তবু যখন সারাজাতির শ্রদ্ধা অর্জন করলেন এই মহীয়সী নারী, তাঁর সকল কাঁটা, সকল ব্যথা ফুল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। মুসলমানদের মধ্যেও যে তিনি কতকখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। মৌলানা সৌকৎ আলি বলেছিলেন :

'শ্রীমতী নাইডুর ওপর মুসলমানদের যতখানি বিশ্বাস এমন আর কোনো হিন্দুর ওপর নয়।'

'ভারতের বুল্‌বুল্' নামে খ্যাত সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত করুণ নয়, বজ্রের মত সুগম্ভীর। সেই স্বর ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রতিধ্বনি তোলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিৎ অবধি কেঁপে ওঠে !

আগাখাঁ-প্রাসাদে ভারতের দুই জাতীয় নেত্রী বন্দিনী ছিলেন : একজন সাধ্বীকুলশ্রেষ্ঠা কস্তুরবা, অপরজন মনস্বিনী সরোজিনী। কস্তুরবার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল সেবাপরায়ণা ভগ্নীর সান্নিধ্যে। তাঁর বাকী কাজটুকু সম্পূর্ণ করবার জন্য সরোজিনী দেবী আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। এই দুই মহাপ্রাণা নারীর জীবনাদর্শের মধ্যে গভীর মিল থাকলেও, বাইরের দিক থেকে তাঁদের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট ছিল। কস্তুরবা ছিলেন প্রায় নিরক্ষরা, আর সরোজিনীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জগৎ-জোড়া। কস্তুরবা নীরবে স্বামীর আদর্শ পালন করে গেছেন, সরোজিনী গুরুর মতবাদ দেশে-বিদেশে সরবে প্রচার করছেন। ভারতের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির এঁরা যেন দুটি দিক। সুগভীর ধর্ম-প্রাণতা ও রাজনীতিতে পরম নিষ্ঠা বর্তমান ভারতীয় নারী-সমাজের বৈশিষ্ট্য। সরল অনাড়ম্বর জীবন আর দেশের মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি আমাদের দেশের মেয়েদের আজ জগত সভায় বরণীয়া করে তুলেছে। এই গৌরব অর্জনের কৃতিত্ব অনেকটাই সরোজিনী নাইডুর প্রাপ্য।

পর্দাপ্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, শিশুমংগল প্রচেষ্টা—সব কিছু সংস্কারমূলক কাজেই তাঁর নিবিড় অনুরাগ। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছেন তিনি। সাহিত্য-শিল্প সংঘ প্রভৃতিতে তাঁর দানও অতুলনীয়। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শ্রমশিল্প সর্ব বিভাগে ভারতের উন্নতিই তাঁর কাম্য। আদর্শ সম্পর্কে তিনি শুধু বক্তৃতাই দেন নি, নিজের জীবনে তার

কঠোর পরিচয়ও দিয়েছেন! মনীষার সংগে কর্মের এমন সুসামঞ্জস্য খুব কম জীবনেই দেখা যায়। এমন কি সরকারও তাঁর দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য দেখে কৈসর-ই-হিন্দ্ স্বর্ণপদক দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

ব্রাহ্মণ-কন্যা সরোজিনী স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন এক অব্রাহ্মণকে। সমাজের কোনো অস্বাভাবিক গণ্ডীকেই তিনি স্বীকার করেন নি। যুক্তিহীন প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বরাবর বিদ্রোহ করেছেন। অন্যায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে তিনি অভিযান করবেন তার আর আশ্চর্য কি? সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় তারা যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল তারও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। সরোজিনী নাইডু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করেছেন।

এত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও হাস্য-পরিহাসে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর রসালো কথাবার্ত্তার খ্যাতি সুদূরপ্রসারী। তাঁর মত অতিথিবৎসল ক'জন আছেন? তাঁর অন্তরের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ভারতের জাগ্রত তরুণের দল। তিনি বলেছেন মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে যেন এই কথাই খোদিত থাকে —She loved the youth of India.

দেশের তরুণরা তাঁর এই অসীম ভালবাসার যেন যোগ্য হতে পারে, বৃদ্ধা অথচ চির-নবীনা এই রমণীর আহ্বানে তারা যেন দেশমাতৃকার চরণে আত্মদান করে!

এই তেজস্বিনী নারীর ভাষণ চিরদিন ভারতের নারীসমাজকে

প্রেরণা দেবে। তাঁর দীপ্ত আহ্বান ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে। মুক্তির সংগ্রামে অন্তঃপুরিকারা আজ সগর্বে এসে পুরুষের পাশে স্থান নিয়েছেন। বিশ বছরেরও আগে সরোজিনীর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল—

I am not afraid of the ultimate sacrifice. I am only a woman, but I am the standard-bearer of your honour and I will see to it—the women of India will see to it—that you men shall no more betray the heritage of our nation. The Indian woman calls—Oh, my men, standup and say what is manhood but sacrifice, what is life except to die that our children may be reborn in their heritage of freedom. And if men falter, as they have done through centuries, go to your homes and let me, a mere woman—let me go to the world and say,—Mother, rise, we redeem you from bondage, rise from the nightmare of slavery. Shall it be left to the women to say that thy sons were faithless but thy daughters have Saved thee ? Vande Mataram.."

এই দৃপ্ত ভাষার সৌন্দর্য অনুবাদে রক্ষা করা কঠিন। তবু ইংরাজী-অনভিজ্ঞের কাছে এই বাণী পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।…

"আমি চরম আত্মোৎসর্গ করতে ভীত নই। আমি রমণীমাত্র। রমণী হলেও আমি তোমাদের সম্মানের পতাকাবাহী এবং আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখব—ভারতের নারীরাও দেখবে—যাতে পুরুষরা আমাদের জাতির ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করতে না পারে। ঐ শোনো ভারতীয় নারীর আহ্বান—আমার দেশের পুরুষ, জেগে উঠে বল, আত্মদান ছাড়া পুরুষকার কোথায়, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যাতে মুক্তির রাজ্যে নবজন্ম লাভ করতে পারে তার জন্য মৃত্যুবরণেই ত সত্যকার জীবন! আর যদি বহু শতাব্দীর ধারা অনুসরণ করে পুরুষরা পিছিয়ে পড়ে, তবে গৃহকোণে ফিরে যাও—সামান্য রমণী আমিই বাইরে বেরিয়ে এসে বলি,—'জননী, ওঠ, আমরা তোমার বন্ধনদশা মুক্ত করব, দাসত্বের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠ!' শেষে নারীদের কি এই কথাই বলতে হবে—তোমার ছেলেরা অকৃতজ্ঞ, কিন্তু তোমার মেয়েরা তোমাকে রক্ষা করেছে? বন্দে-মাতরম্!"
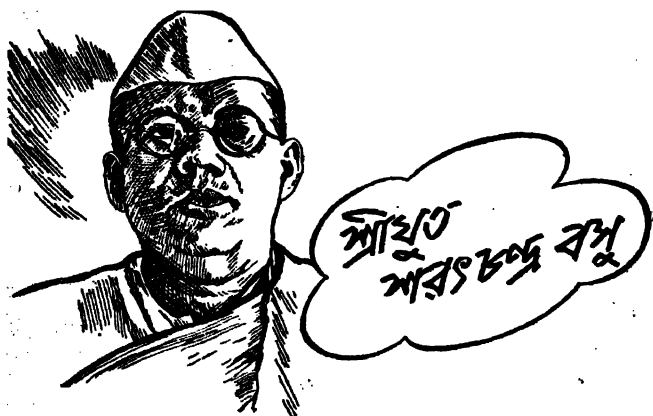
শরৎচন্দ্র * পণ্ডিতজীর সমবয়সী। দেশপূজ্য জানকীনাথের সন্তান তিনি। কটক ও কলকাতায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৩ সালে ব্যারিষ্টার হয়ে আসার পর আইনজীবী হিসাবে তাঁর যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশসেবায় নিরত না থাকলে তিনি প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করতে পারতেন। কর্পোরেশনের অল্-ডারম্যান ও আইন-সভার সদস্যরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়। ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে সরকার তাঁকে তিন বৎসর আটক রাখেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বংগীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসদলের নেতা নির্ব্বাচিত হন। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দেশ-প্রাণতার

* ইনি বর্তমানে কংগ্রেসের সংগে সংশ্রব ত্যাগ করলেও পূর্ব-সম্পর্কের কথা স্মরণ করে' এর চরিত্র-চিত্র এখানে দেওয়া হ'ল।

পুরস্কার হিসাবে তিনি নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন। সন্ত্রস্ত সরকার মাদ্রাজের এক জেল থেকে আর এক জেলে তাঁকে নিয়ে যেতে লাগল। মুক্তির পর জনগণ তাঁকে বরণ করে নিল প্রিয়তম নেতারূপে। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার-বিরোধী-দলের নেতারূপে তিনি উচ্চ সম্মান লাভ করেন। অন্তর্বর্তী জাতীয়-সরকারের খনি, বিদ্যুৎ ও পূর্তসচিবের পদে তাঁর নিয়োগ শরৎচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। কংগ্রেস পরিচালক-মণ্ডলীতে তিনি একাধিকবার সভ্যের কাজ করেছেন। বর্তমানে বাংলা প্রদেশের তিনি অন্যতম রাজনীতিক। তাঁর সংগঠন-শক্তি, আর্তের জন্য দরদ, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, সত্যই অতুলনীয়।

কল্‌কাতায় যখন পৈশাচিক মৃত্যুলীলা চল্‌ছিল, নির্ভীক শরৎচন্দ্র শান্তির বাণী নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই উপস্থিত হয়ে ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর প্রচেষ্টায় বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা প্রতিশোধ গ্রহণে নিরস্ত হয়েছিল। ছাত্র-আন্দোলনেও তাঁর দান বড় কম নয়। নোয়াখালিতে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে আর্ত-ত্রাণের প্রয়াস করেছেন। বাংলার দুর্দশাকে সর্বভারতীয় প্রশ্ন করে তোলবার কৃতিত্ব তাঁর অনেকখানি। গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন, নেতাজীর অমর আদর্শে তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা, বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। বাংলার দুর্গত জনগণ তাঁর কাছ থেকে অনেক আশা করে। নেতাজীর অসমাপ্ত কাজের

ভার যদি নেতাজীর অগ্রজ অক্লান্তকর্মী শরৎচন্দ্র নিজের মাথায় তুলে না নেন, তবে আর কে নেবে এই বিরাট দায়িত্ব ?

সরকার যখন বিনা বিচারে শরৎচন্দ্র বসুকে বন্দী করে তার প্রিয় দেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল, তখন সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদের আলোড়ন উঠেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল পরাধীন জনতার আর্তনাদ। জাপানকে পর্যুদস্ত করার পরও সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন বৃটিশ-বিরোধী এই মানুষটি দেশের তরুণ দলকে নিয়ে এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সূচনা করতে পারেন।

তাই দীর্ঘ চার বছর পরে তাঁরা এই দেশপূজ্য নেতাকে মুক্তি দিলেন। শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য তখন ভেংগে পড়েছে। নেতাজীর সংগে বিচ্ছেদ, পরিবারের ওপর উৎপীড়ন, আর্থিক অসচ্ছলতা, তাঁর মনকে খুবই বিচলিত করে তুলেছিল। তবু মুক্তির সংগ্রামে অগ্রদূতরূপে দেখা দিলেন বাংলা মা'র এই প্রিয় সন্তান; সুপ্ত বঙ্গদেশ আবার জেগে উঠ্‌ল। কংগ্রেসের সংগঠন, হিন্দু-মুসলীম ঐক্য, জনগণের দুঃখ নিবারণ প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানে তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করলেন। কারামুক্তির সময় যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন—

> There is nothing wrong in the Quit India formula of Gandhiji. But I would like it to be Quit Asia.

সেই কথাই কাজে পরিণত করবার জন্য তিনি মহাব্রতে ব্রতী হ'লেন।

আজ শরৎচন্দ্র বসু বাংলার সর্বত্র বীরের মত আত্মরক্ষা করার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। দুষ্কৃতকারীদের ভয়ে আমরা পালিয়ে আসব না, নির্ভীকহৃদয়ে তাদের প্রতিরোধ করে আমরা সত্য ও আদর্শকে জয়যুক্ত করব। মনের মৃত্যুই ভয়াবহ —দেহের মৃত্যুর চেয়েও অধিক বিপজ্জনক। তিনি বলেছেন,

"Be fearless. Arise and defend yourself with all energies at your command.

সাংবাদিক-সম্মেলনে তিনি এই অভিমত দেন যে :

"স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হইবে, এবং ঐক্যের বাণী প্রচারের সংগে সংগে প্রয়োজন হইলে হাঙ্গামাকারীদের তাহারা প্রতিরোধ করিবে।......গান্ধীজী ঐক্য স্থাপনের জন্য নোয়াখালিতে যে প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহার সহিত এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের কোন অসামঞ্জস্য বা সংঘাতের সম্ভাবনা নাই—স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ঐক্য ও মৈত্রীর বাণীই বহন করিবে।"

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, সুভাষের জন্মভূমি বাংলা দেশ। একদিন বাংলা সারা ভারতকে পরিচালিত করেছে। আজ তার বড় দুর্দশা। অত্যাচার, অপমান, অন্তর্দ্বন্দ্ব এই সুজলা সুফলা দেশকে

জীর্ণ করে ফেলেছে। পরম আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি—বাংলার অমর ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার রাষ্ট্রনায়ক শরৎচন্দ্র নবজাগরণের সংকেত দিন। তাঁর দৃপ্ত আহ্বান সফল হোক্। তিনি বলেছেন—

"Be real heroes in the strife. The drum is silent today, but it will be sounded soon and then it will be time for young-men and women to come forward and acquit themselves creditably.

ভারতের সব চেয়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিচ্ছেদ সাময়িক হোক্—তিনি আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'ন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

মৌলবী রফি আমেদ কিদোয়াই

১৮৯৪ সালে যুক্তপ্রদেশের এক জমিদার পরিবারে এঁর । আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে ইনি আইন ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু আইনজ্ঞ হয়েও অন্যায় আইন ভঙ্গ করাই তাঁর পেশা হয়ে দাঁড়াল। মৌলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্ব তিনি মেনে নিলেন।

১৯২৯ সালের অসহযোগ আন্দোলন যেমন হাজার হাজার আদর্শবাদী যুবককে গ্রাস করেছিল—কিদোয়াই সাহেবও সেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। সেদিন যে কর্মজীবন সুরু হয়েছিল, গত ২৫ বছর ধরে অকুণ্ঠিত চিত্তে এই মহাপ্রাণ মুসলমান নেতা তা বহন করে আসছেন। কংগ্রেসের গৌরবময় ইতিহাসের সংগে তাঁর দেশসেবার কাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িত। মৌলবী রফি আমেদ পণ্ডিত মতিলালের সেক্রেটারী ছিলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাজ্য দলের 'হুইপ' হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সুবিস্তৃত। আগ্রা ও অযোধ্যা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির তিনি সভাপতিত্বও করেছেন। ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যরূপে তিনি সুপরিচিত। বহুবার কারাবরণ করে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় যুক্তপ্রদেশের অসামান্য সাফল্য তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার উজ্জ্বল প্রমাণ। ১৯৩৭ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশের রাজস্ব ও কারাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হ'ন। সেই সময় তাঁর অভিনব কর্মকুশলতা দেখে শত্রু-মিত্র সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। বহু সংস্কার সাধন করেছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের যোগাযোগ সচিব। এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর যোগ্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেসের প্রতি কিদোয়াই-এর নিষ্ঠা অবিচলিত। মানবসেবাই তাঁর জীবনের ব্রত। অথচ এই মৃদুভাষী পুণ্যচরিত্র লোকটিকে শ্বেতাংগ রাজকর্মচারীরা বাঘের মত ভয় করেন। সর্দার প্যাটেলেরই তিনি ছোট সংস্করণ। দাঙ্গানিরোধে, অনৈক্য দূরীকরণে, শান্তিপ্রতিষ্ঠায়, জনগণের উন্নতিবিধানে তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যুক্তপ্রদেশ কেন, সমগ্র ভারতই এই নেতাকে অন্তরে বরণ করে নিয়েছে। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মুসলমানটি পাকিস্তান-ওয়ালাদের ষড়যন্ত্র বার বার ব্যর্থ করে দিয়েছেন। জাতীয়বাদী মুস্লিম সমাজের তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। গণপরিষদের সভ্য হিসাবে

যাঁরা ভারতের ভাবী রাষ্ট্রপরিকল্পনা গড়ে তুলবেন, রফি আমেদ কিদোয়াই তাঁদের মধ্যে একজন।

পণ্ডিতজী এবং মৌলানার মত কিদোয়াই-এরও পড়াশোনার দিকে খুব বেশি ঝোঁক। রহস্যপ্রিয়তাও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। শাসনতন্ত্রে যেমন তাঁর ব্যুৎপত্তি, বিপ্লবের প্রতিও তেমনি অনুরক্তি। লবণ আইন ভংগের সময় গান্ধীজীর নির্দেশকে তিনি জয়যুক্ত করেছিলেন। গ্রামের চাষীরা তাঁকে আপনার জন বলেই জানে। নিজেকে কোনদিন জাহির করেন না কিদোয়াই সাহেব। নীরবে অক্লান্তভাবে কংগ্রেসের কাজ করে যাওয়াই তাঁর জীবনের ধর্ম। কিষাণ সভাগুলির প্রাণস্বরূপ তিনি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি প্রিয়পাত্র। মৌলানা সৌকত আলি, মহম্মদ আলি, মৌলানা আজাদ, সীমান্ত গান্ধী, আসফ আলি, অধ্যাপক বারি প্রভৃতির মত জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান হিসাবে চিরস্মরণীয় হ'বার দাবী তিনিও রাখেন। জন্মবিপ্লবী তিনি। তিনি অন্যায়কে কঠোর হাতে শাসন করতে পারেন। আগষ্ট-বিপ্লবের সূচনা তিনি অনেক আগেই করেছিলেন তাঁর জ্বলন্ত বক্তৃতার ভিতর দিয়ে। তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস, তাঁকে আরও গৌরবের শিখরে উন্নত করবে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় তিনি স্থান পেয়েছেন। কিদোয়াই সাহেব যোগাযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর পরম আস্থাভাজন তিনি।

কংগ্রেসের কাছে হিন্দু-মুস্‌লিমে যে কোনো ভেদ নাই, রফি আমেদের উচ্চতম পদনিয়োগে তা সপ্রমাণ হয়েছে। এই সব মহাপ্রাণ মুসলমানেরাই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে আবার একসূত্রে বেঁধে দিতে সাহায্য করবেন। সেই শুভদিনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আজ আমরা যেন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের উর্ধে ওঠবার চেষ্টা করি।

আচার্য যুগলকিশোর

কংগ্রেস পরিচালক-মণ্ডলীতে ইনি নবাগত। স্বল্পপরিচিত এই ব্যক্তিটি একেবারেই কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ-সম্পাদকের পদ লাভ করলেন—তা'তে মনে হয় রাষ্ট্রপতি কৃপালানী এঁর যোগ্যতার প্রমাণ পেয়েছেন। শ্রীযুগলকিশোরের বাসস্থান যুক্তপ্রদেশে। ১৮৯৩ সালে তাঁর জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে অনার্স নিয়ে তিনি বি-এ পাশ করেন। বহু জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আছে। শিক্ষাকার্যে তাঁর অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। শিক্ষক-রাষ্ট্রপতি তাঁরই মত একজন শিক্ষককে সম্পাদকের পদে বরণ করে শিক্ষা-ব্রতীদের সম্মান বর্ধন করেছেন। ভারত শিক্ষাদীক্ষায় আজ অনেক পিছিয়ে আছে। শতকরা ১১ জন ভারতবাসীর অক্ষরের সংগে পরিচয়। অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে পারে না। রুশজাতির সফলতার মূলে তার ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। আচার্য যুগলকিশোর এই দিক দিয়ে দেশের অনেকখানি সেবা করতে পারবেন।

কংগ্রেস বুনিয়াদি-শিক্ষাপ্রণালীকে আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। দেহ-মন-আত্মা একই সংগে বিকশিত হয়ে মুক্ত মানবকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে দেবে, এই আমাদের অন্তরের কামনা। শ্রীযুগলকিশোর যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ও সাধারণ-সম্পাদকের কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা বিস্তৃত ক্ষেত্রে আজ তিনি কাজে লাগাবেন। এই নিরলস, নিরহংকার মানুষটি বন্ধুজনের প্রিয়। কঠোর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তিনি স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে চলেছেন। যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস মনোভাবের জন্য সুবিখ্যাত। বহু বীর সৈনিকের উদ্ভব হয়েছে এই জায়গা থেকে। পণ্ডিত জওহরলাল, পণ্ডিত মালবীয়, পণ্ডিত পন্থ, কিদোয়াই প্রমুখ বহু দেশ-নায়কের সাধনার ক্ষেত্র যুক্তপ্রদেশ। তাঁদের প্রেরণা আচার্য যুগলকিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আমরা সর্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাস করি। শ্রীশংকররাও দেও-এর মত সর্বত্যাগী দেশনায়ককে তিনি পেয়েছেন সহযোগিরূপে। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ভারত-গগনে মুক্তির সূর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, কংগ্রেসের জয়রথ পৃথিবী মুখরিত করে আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হোক্—এই আমাদের একান্ত কামনা। জওহরলাল, রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রমুখ ধুরন্ধররা যে পদ অলংকৃত করেছেন আজ যুগল-কিশোর সেই গৌরবময় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত—কংগ্রেসের মহান্ ঐতিহ্য তাঁর হাতে অম্লান ও অটুট থাকুক, যুগান্তের ক্ষণে আজ আমরা এই প্রার্থনাই করব।

সম্পাদক হিসাবে একটি বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যাপক যুগলকিশোর বলেছেন,—

> We must never use the Congress as an instrument for self-aggrandisement or for the advancement of narrow party or sectional interest.

গঠনমূলক কর্মপন্থায় তাঁর অটুট বিশ্বাস। অহিংস সমাজ-বিপ্লবই তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি চান, গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস-কর্মীরা ছড়িয়ে পড়ুক, জনগণের বন্ধু এবং পরিচালক হিসাবে কাজ করুক, গ্রাম্যজীবনকে রূপান্তরিত করতে না পারলে আমাদের সত্যকার মুক্তি আসবে না। আচার্য যুগলকিশোরের এই সত্য দৃষ্টি আমাদের চলার পথে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকুক!
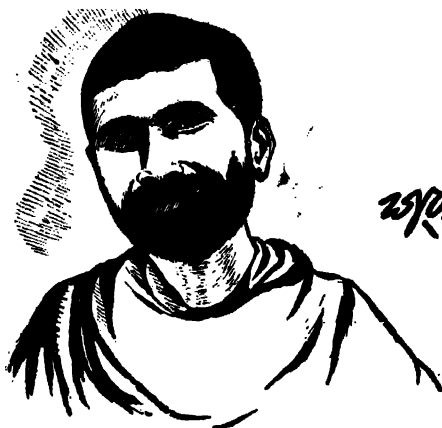
শংকররাও দেওকে আমরা 'মহারাষ্ট্র-গৌরব' বলে অভিহিত করতে পারি। ইনি বহুদিন ধরে রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির সভ্য আছেন। এই নিরভিমানী কটিবাসপরিহিত সন্ন্যাসীকল্প নেতা সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

১৮৯৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী স্বাধীনতার জন্মভূমি মারাঠা দেশে তাঁর জন্ম হয়। রাউলাট সত্যাগ্রহের সময় তিনি আইন-অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন। গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি কংগ্রেসের সেবা করে আসছেন। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহারা শংকররাও নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে, অতুল আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আজ সর্বভারতীয় নেতারূপে পরিগণিত হয়েছেন।

অসীম অধ্যবসায়, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, শান্ত প্রকৃতি, তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র। বীর শিবাজীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে, গান্ধীজীর সাহচর্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়ে শ্রীশংকররাও দেও কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। গঠনমূলক কর্ম-পন্থায় তাঁর গভীর বিশ্বাস। স্বদেশী ব্রত উদ্‌যাপন তাঁর চরম লক্ষ্য।

শংকররাও একজন সুলেখক। মারাঠি ভাষায় তিনি সাতাশ খানি বই রচনা করেছেন। দৈনিক "লোকশক্তি"র তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অগ্নিময়ী লেখনী মুক্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে। তাই এই পত্রিকা সরকারের কোপদৃষ্টি এড়াতে পারে নি। দুঃশাসনী আইনের কবলে তিনিও পড়েছেন, তাঁর কাগজও বন্ধ হয়েছে। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষাতেও তাঁর অসাধারণ দখল। তাঁর স্মরণশক্তি অনন্যসাধারণ। গীতা এবং উপনিষদ্ তাঁর কণ্ঠস্থ। আহ্‌মদ্-নগর দুর্গ প্রতিদিন তাঁর সুললিত বেদপাঠে ঝংকৃত হয়ে উঠ্‌ত। প্রকৃত হিন্দুর নিষ্ঠা শংকররাওয়ের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর Feathers and Stones বইয়ে শকংররাওয়ের দৈনন্দিন বন্দী জীবনের সুন্দর ছবি এঁকেছেন। তিনি রান্নার ব্যাপারেও কতখানি পটু আমরা তাঁর পরিচয়ও পাই। ব্যাডমিন্টন খেলাতেও তাঁর পারদর্শিতা যথেষ্ট। ভারতের শ্রেষ্ঠ কংগ্রেসনেতারা আহ্‌মদনগর দুর্গে বন্দী ছিলেন আগষ্ট আন্দোলনের সময়। তাঁদের মধ্যে শংকররাও আর

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সবচেয়ে ভাল ব্যাডমিণ্টন খেলতেন। পরম পণ্ডিত শান্তস্বভাব দেওজীর চরিত্রের এ এক অভিনব দিক্। শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও তিনি গোঁড়া নন। সর্বভূতে ভালবাসাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। অথচ এই সংযত-চরিত্র মানুষটি যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, তখন তাঁর মূর্ত্তি আর একরকম। তাঁর মানসিক গঠন ইস্পাতের মত মজবুত।

শারীরিক সজীবতাও তাঁর আশ্চর্য। একটু নমুনা দিই। ৯ই আগষ্ট যখন নেতাদের বন্দী করে ট্রেনে আহ্‌মদ্‌নগরে' নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পুনা ষ্টেশনে ছেলেদের দল তাঁদের দেখে জয়ধ্বনি করায় পুলিশ এই কিশোরদের লাঠিচার্জ করতেও দ্বিধা করে নি। ক্রুদ্ধ জওহরলাল ছুটে গেলেন পুলিশদের দিকে চিৎকার করে—To Hell with the Lathi charge! Dare you lathi charge the boys!

পণ্ডিতজী যখন মুষ্ট্যাঘাতে পুলিশকে বিব্রত করে তুলেছেন তখন ব্যাপার সুবিধাজনক নয় দেখে শংকররাও দেও রেল-কামরার জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন জওহরলালকে নিরস্ত করবার জন্য। কিন্তু বাদ সাধল আর এক পুলিশ কর্মচারী। সে শংকররাওয়ের কটিবাস ধরে টেনে এনে জোর করে তাঁর জায়গায় বসিয়ে দিল।
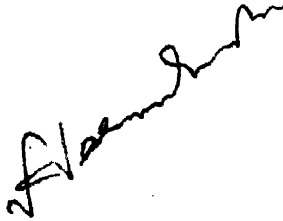
ইতিমধ্যে পণ্ডিতজীও ফিরে আসায় ব্যাপারটি শেষ হ'ল সেইখানেই।

চিরকুমার ধর্মপ্রাণ শংকররাও দেও আজ অহিংস সংগ্রামের

সৈনিক। মারাঠাবীর শিবাজী সশস্ত্র অভিযানে যে স্বপ্ন সফল করতে চেয়েছিলেন, বহুযুগ পরে আর এক দেশপ্রাণ মারাঠী অন্য পথে সেই স্বাধীনতার জয়ধ্বজাই বহন করে চলেছেন। সার্থক হোক তাঁর অভিযান।

শংকররাও সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করেন। স্বাধীন ভারতে কৃষক-মজুরের রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে—এই আশ্বাসই তিনি দিয়েছেন জনগণকে। আমরা সর্বত্যাগী এই নেতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যেন সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে পারি!

সর্দার প্রতাপ সিং

শিখরা বীরের জাতি। গুরু নানকের ধর্ম্মের প্রভাব ও গুরুগোবিন্দ সিংএর কর্মপ্রেরণা পঞ্জাবের এই দীর্ঘকায়, সুঠাম, সবল লোকদের ভারতের মুক্তি-সাধনার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সাহায্য করেছে। এই নির্ভীক জাতির প্রতিনিধি সর্দার প্রতাপ সিং। বাবা গুরুদিৎ সিং, সর্দার অজিৎ সিং, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ স্বদেশপ্রাণ বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতারা যে গৌরবময় ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন, প্রতাপ সিং তারই অধিকারী। তিনি পঞ্জাবে কংগ্রেসের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক যুগান্তরের দিনে অন্তবর্তী সরকারে সর্দার বলদেব সিং ও কংগ্রেস পরিচালকমণ্ডলে সর্দার প্রতাপ সিং-এর পদ খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভারতের নবজন্মে পাঞ্জাবীদের দানও দেশবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

সর্দার প্রতাপ সিং শিক্ষালাভ করেছেন আমেরিকায়। তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক

বিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেন। দীর্ঘ ন'বছর মার্কিন দেশে কাটিয়ে ১৯২৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। জগতের নানা দেশ ঘুরে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে দেখলেন সেখানে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা মানুষকে জাগিয়ে তুলেছে। পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছে কংগ্রেস। ভবনে, উদ্যানে, শোভাযাত্রায়, ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয়-পতাকা জাতির কাছে বহন করে এনেছে এক নতুন জীবনের বাণী। কিষাণ-মজদুররা বহুদিনের শৃংখল ছিন্ন করবার জন্য বদ্ধপরিকর।

সর্দার প্রতাপ সিং নিজে কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে মজুরের কাজ করেছেন; সমাজের নিম্নতম স্তরের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তিনি ভারতের নবজাগরণকে অভিনন্দিত করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? যারা বঞ্চিত, বুভুক্ষু, নিষ্পেষিত তাদের কানে মুক্তির বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তিনিও কংগ্রেসের সংগে হাত মেলালেন। জাতীয় নেতারা তাঁকে সাদরে বরণ করে নিলেন। ফলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রীর দল তাঁর পিছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করল। কিন্তু সর্দার প্রতাপ সিং ভয় কা'কে বলে তা কোন দিন জানেন না। তাঁর কর্মোদ্যমে বাধা দেয় বৃটিশ সরকারের সাধ্য কি?

১৯৩২ সালে অমৃতসর কন্‌ফারেন্সের পুরোহিত হিসাবে তিনি কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করায় সরকার কর্তৃক বন্দী হলেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা এক অপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল। যতক্ষণ না তাঁর ভাষণ শেষ হয় ততক্ষণ পুলিশকে

অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পুলিশকে উপেক্ষা করে তিনি কন্‌ফারেন্সের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন বীরদর্পে।

কিছুকাল ধরে সরকার তাঁকে অন্তরীণ করে রাখেন। তবু তাঁর কর্মশক্তি অব্যাহত রইল। শত বাধা সত্বেও কিষাণ সংগঠনের কাজ চালালেন পুরোদমে। তা ছাড়া "দেশ-ভগৎ পরিবার-সহায়ক সভা"র তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী-পরিবারের ভরণপোষণের জন্য, তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য এই সমিতির সৃষ্টি হয়। বন্দী জীবনকেও কাজে লাগাবার অদ্ভুত দক্ষতা আছে সর্দারজীর। বার বার পুলিশের চক্রান্তকে তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

সর্দার প্রতাপ সিং পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির পূর্বতন সম্পাদক। New Era পত্রিকারও তিনি সম্পাদক ছিলেন। পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদ ও গণপরিষদেরও তিনি সদস্য। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযুক্ত থাকায় তিনি প্রদেশের সর্বত্র ও তার বাইরেও শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। খালসাদের বীর মনোভাব তাঁর জন্মগত সম্পদ্। কংগ্রেসের মহান্ আদর্শ তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এমন মানুষকে নেতারূপে পেয়ে শুধু তাঁর জন্মস্থান কেন, সারা ভারত ধন্য হয়েছে। আমাদের গৌরবময় অভিযানে সর্দারজীর স্থান পুরোভাগে থাকবে, এই আমাদের অন্তরের আকাংখা। সকলে মিলে কদম্-কদম্ এগিয়ে চলি আজ মুক্তিতীর্থ অভিমুখে। 'পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ' বিজয়গর্বে দৃঢ়পদক্ষেপে মুক্তির 'লালকেল্লা' দখল করুক! রক্তের অক্ষরে রচিত হোক্ যুগান্তরের ইতিহাস!

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

সারা পৃথিবী বিস্মিত হয়ে গেছে অগাষ্ট বিপ্লবের স্বরূপ দেখে।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "অগাষ্ট প্রস্তাব আমার প্রাণবায়ুর সমান"।

রাষ্ট্রপতি কৃপালানীর অভিমত—অগাষ্ট আন্দোলন কংগ্রেসকে যে মর্যাদা দিয়েছে তারই ফলে সে আজ স্বাধীনতার দ্বারে সমুপস্থিত।

ভারতের এই স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রধান সৈনিক ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। হাজারীবাগ জেল থেকে কয়েকজন সংগীসহ তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান নেতাজীর অদৃশ্য হওয়ার মতই বিস্ময়কর। তারপর অজ্ঞাতবাসের পালা। দিনের পর দিন ছোটনাগপুরের ব্যাঘ্রসংকুল জংগল তাঁকে পায়ে হেঁটে পার হতে হয়েছে—রক্তাক্ত চরণে নিশ্চিত মৃত্যুকেও অতিক্রম

করেছেন তিনি ; সুদূর নেপালে তাঁর অবস্থিতি,...পুলিশের সংগে সংঘর্ষ...রোমাঞ্চকর কাহিনীর মত। এই গল্পগুলি ভারতের রাজনৈতিক রূপকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিপ্লবের সময় 'ভারতের কোনো জায়গা থেকে' তিনি যখন অগ্নিময়ী বাণী দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াতেন— জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠত, সন্ত্রস্ত সরকারের হৃৎকম্প উপস্থিত হত। গোপন বেতার-বার্তা প্রচার, অদৃশ্য সত্যাগ্রহী-দল গঠন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র বাস্তব প্রকাশ, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৈপ্লবিক কাজে জয়প্রকাশ নারায়ণ যে সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আত্মদানের পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বাধীন দেশেও একান্ত দুর্লভ। তিনি বিপ্লবীদের 'মুকুটহীন রাজা'। তাঁকে ঘিরে যে শক্তিশালী কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক-দল গড়ে উঠেছে তার মধ্যে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। মুক্তি সংগ্রামে এঁরা এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ ১৯০৩ সালের ১১ই অক্টোবর বিহারের সীতাবদিয়ারা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পল্লীভারতের প্রতীক তিনি। ১৮।১৯ বছর বয়সের আগে তিনি শহর দেখেন নি, ট্রামগাড়ী কা'কে বলে ছেলেবেলায় তিনি তা জানতেন না। পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করবার পর আজও তাঁর সেই সরলতা,

পল্লীপ্রাণতা বর্তমান। চাষী-মজুরের আপনজন তিনি। সর্বোচ্চ শিক্ষা পেয়েও তিনি ভারতের মাটির মানুষ হয়েই রয়েছেন।

১৯২২ সালে তিনি আমেরিকার ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ন। সে দেশে থাকা ও পড়ার খরচ যোগাবার জন্য তিনি ফলের ক্ষেতে মজুরের কাজ করতেন। আঙুর, পিচ, বাদাম প্রভৃতি তুলে চূণ আর গন্ধকের দ্রবণে ধুয়ে, শুকিয়ে বাক্সবন্দী করতে হ'ত। খারাপ ফলগুলি বেছে বেছে ফেলে দেওয়া ছিলো জয়প্রকাশের প্রধান কাজ। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একটানা চলত পরিশ্রম। সবল তরুণের কাছে সেটা অকিঞ্চিৎকরই ছিল। কলেজ খুললে পড়াশুনা সুরু করে দিতেন। রান্নাবান্না থেকে সব কাজই নিজেকে করতে হ'ত। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জন করলেন এই মেধাবী, সুদর্শন ভারতীয় ছাত্রটি; অথচ রেস্তরাঁর 'বয়' বা কারখানার মিস্ত্রীর কাজ করতেও দ্বিধা করেন নি জয়প্রকাশ তাঁর ছাত্রজীবনে।

মার্কিনদেশের এক সম্প্রদায়ের বিরাট ধনসম্পদ আর অন্যদের দুঃখময় দারিদ্র্য দেখে জয়প্রকাশের অন্তরে প্রশ্ন জাগল,—এই বৈষম্যের মূল কোথায়? একজন থাকবে দুধেভাতে, আর একজন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও অন্ন জোটাতে পারবে না—এ সমাজ-ব্যবস্থা অসহ্য। ক্রমে নানা পড়াশুনা ও চিন্তার ফলে জয়প্রকাশ হয়ে উঠলেন খাঁটি

সাম্যবাদী। নতুন জগৎ খুলে গেল তাঁর চোখের সামনে। অর্থনীতিতে তাঁর এম. এ.'র পরীক্ষাপত্র অধ্যাপকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করল। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজনীতি বহু বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে তিনি ভারতে ফিরলেন আট বছর পরে।

স্বদেশে ফিরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হ'লেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। জহরলাল তাঁর ওপর শ্রমিক সম্পর্কীয় গবেষণা বিভাগের ভার দিলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসে অস্থায়ী সাধারণ-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। নাসিক জেলের মধ্যে বসে জয়প্রকাশ প্রগতিশীল তরুণ বন্দীদের নিয়ে পরিকল্পনা করলেন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন! মুক্তির পর তরুণ সিংহের বিক্রম নিয়ে ১৯৩৩ সালে এই শক্তিশালী দল গঠন করলেন।

এই বৈপ্লবিক কর্মপন্থার অংকুর জয়প্রকাশের ছেলেবেলাতেই সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েও তিনি তা ভোগ করতে পারেন নি। আমেরিকায় গিয়েও তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরলেন বৃহত্তর পটভূমিকায়, মহত্তর স্বপ্ন নিয়ে চোখে। তাঁরই ইংগিতে কংগ্রেসে বামপন্থী দলের উদ্ভব হল। ধনী-দরিদ্রের বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল

তাঁদের কাম্য। কৃষাণ-মজুর আন্দোলন প্রসারিত হ'ল দিকে দিকে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ একজন উঁচুদরের লেখক। তাঁর 'Why Socialism' গ্রন্থ অতুলনীয়। অগাষ্ট বিপ্লবের ইস্তাহার-গুলিও স্থায়ী সাহিত্যের অংগ! একটি পুস্তিকা থেকে তাঁর দৃষ্টিভংগির কিছু পরিচয় দিই—

"বর্তমান সময়ে আমরা যে উপায়ে এই সংগ্রাম চালাতে পারি, তা হচ্ছে 'গণশক্তি' গঠন করে। গণ-শক্তি গঠনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রথমত পড়ে সংগ্রামের জন্য জনগণের মানসিক প্রস্তুতি; দ্বিতীয়ত জনগণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যেমন কিষাণ-মজদুর সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। ছাত্র ও যুবসমিতি, গ্রাম-সরকার, তন্তুবায় সমবায়-প্রতিষ্ঠান এবং আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান যা জনগণের সমষ্টিগত শক্তি ও চেতনাকে গড়ে তুলতে নানা উপায়ে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও আর একটি প্রধান কাজ হচ্ছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তুলে জনগণের সংগে এর কার্যকরী যোগাযোগ নূতন ও ব্যাপকভাবে স্থাপন করা।"

এবার বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জয়প্রকাশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দুদের বুঝিয়েছেন, আত্মকলহ করলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পিছিয়ে যাবে। ছাত্র-তরুণদের ওপর তাঁর প্রভাব অসাধারণ। পণ্ডিত নেহেরুও যেখানে আমল পান্‌নি সেখানে

জয়প্রকাশের বক্তৃতার ফল হয়েছে অত্যাশ্চর্য। বিহারে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। দেওলী বন্দীনিবাসে ৩১ দিন অনশন করে তিনি সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। পর্বতপ্রমাণ বাধাও তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির সামনে অকিঞ্চিৎকর।

পুলিশের নির্মম অত্যাচার, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ, সাম্রাজ্যবাদীর মারণাস্ত্র তোমার কাছে উপেক্ষার বস্তু—হে বীর সৈনিক, রক্তসিক্ত স্বাধীন ভারতের অভিনন্দন গ্রহণ কর !
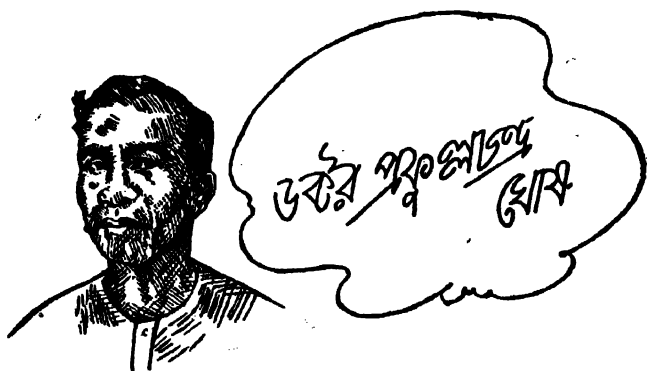
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। বাংলা দেশের ঘোর দুর্দিনে তিনি শাসন ভার গ্রহণ করেন। একদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম-লীগ, অপর দিকে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ সরকার—এই দুইয়ের সম্মিলিত শক্তির আঘাতে বাংলার জাতীয় শক্তি যখন প্রায় ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত, সেই সময় রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন দৃঢ়চেতা, দুঃসাহসী নির্ভীক ও নিষ্কলঙ্ক নেতার। পশ্চিম-বঙ্গ পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ জাতির এই দুঃসময়ে নেতৃ-নির্বাচনে ভুল করেনি। নির্বিবাদে, বিনা দ্বিধায় যাঁকে তাঁরা দেশের নেতৃত্বে বরণ করলেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী নন, এমন কি তখন পর্য্যন্ত তিনি ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত

কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা।

সদস্যও নন, কিন্তু ত্যাগে, দৃঢ়তায় এবং চরিত্র-মাধুর্যে তাঁর সমকক্ষ লোক শুধু বাংলায় কেন সমগ্রভারতবর্ষে খুব কমই আছেন।

চেহারায়, বেশভূষায় বা আচার-ব্যবহারে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই। অতি সহজেই তিনি জনসাধারণের মধ্যে তাদেরই একজন হিসাবে মিশে যেতে পারেন। কিন্তু এই সাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতির ভিতরে যে অসাধারণ প্রতিভা, প্রচণ্ড কর্মশক্তি এবং অনমনীয় দৃঢ় মন থাকতে পারে, ডক্টর ঘোষকে না দেখলে বা তাঁর কার্যকলাপের সংগে পরিচিত না হলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

ঢাকা জেলায় পদ্মাতীরে মালিকান্দা গ্রাম ডক্টর প্রফুল্ল-চন্দ্রের জন্মভূমি। ১৮৯১ সনের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন সাধারণ শিক্ষক। বাল্যকাল থেকেই কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডক্টর ঘোষকে বিদ্যার্জন করতে হয়েছে। ছাত্র-জীবনের প্রথম হতেই অত্যন্ত মেধাবী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। বস্তুত পক্ষে অতখানি মেধাবী না হলে তাঁর পক্ষে হয়তো উচ্চ শিক্ষা অর্জন করাই সম্ভব হতো না। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা থেকেই তিনি বৃত্তি লাভ করতে শুরু করেন এবং এইরূপে প্রত্যেক পরীক্ষালব্ধ বৃত্তির সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সোপান অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

১৯০৯ সনে ঢাকার পোগোজ স্কুল হতে এনট্রান্স পাশ

করবার পর প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং অচিরেই ঢাকার একজন অন্যতম প্রতিভাবান ছাত্র বলে খ্যাতি লাভ করেন। এই কলেজেই অধ্যাপক ই. আর. ওয়াট্‌সনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মিঃ ওয়াট্‌সন রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রফুল্লচন্দ্রও ছিলেন রসায়নশাস্ত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগী। কাজেই ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হতে বেশী দেরী লাগল না। প্রফুল্লচন্দ্রের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, একাগ্রতা, অধ্যবসায় এবং আড়ম্বরহীনতার মধ্যে অধ্যাপক ওয়াট্‌সন অসাধারণ কিছুর সন্ধান পেলেন এবং সযত্নে সেই সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বস্তুতঃ, প্রফুল্লচন্দ্রের অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা, চরিত্রের দৃঢ়তা, অকপট ব্যবহার এবং শিশুসুলভ সরলতা—এর অনেকখানিই তিনি অধ্যাপক ওয়াট্‌সনের সাহচর্যের ফলে লাভ করেছেন। ঢাকা কলেজ হতে কৃতিত্বের সহিত আই-এস-সি ও বি-এস-সি পাশ করবার পর তিনি এম-এ পড়বার জন্য কলিকাতা আসেন এবং ১৯১৬ সনে এম. এ. ও এম-এস-সি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে রসায়নে এম-এ পাশ করেন। ইহার পরই তিনি রসায়নের রিসার্চ স্কলার হিসাবে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন এবং পরে ১৯১৯ সনের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নে বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে এবং ১৯২০ সনে তিনি

Synthetic and Natural Dyes সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

দারিদ্র্যের সংগে কঠোর সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে জীবনে অনেক প্রকার প্রলোভনকেই জয় করতে হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। মানসিক বা দৈহিক সর্ব প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হতেই তিনি সর্বদা যেন আত্মরক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান তিনি কখনই উপেক্ষা করতে পারেন নাই। সাধারণ দরিদ্র ঘরের মানুষ বলেই হয়তো দরিদ্রের দুঃখ দূর করে তাদের মুখে হাসি ফুটাবার প্রবল আগ্রহ তাঁর ছিল। অন্তরের এই আকুল আগ্রহই তাঁকে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং দেশের দুর্দশা ঘুচাবার জন্য তিনি মুক্তি-পাগল দেশসেবকদের সংগে নিজের জীবনকে মিশিয়ে দেন। ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি অনুশীলন-দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সচেষ্ট হয় এবং এই কারণেই পাঠ্যাবস্থায় তাঁকে ঢাকা পরিত্যাগ করে কলিকাতা চলে আসতে হয়। কলিকাতায় আগমনের পর ১৯১৩ সনে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর আলাপ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিব্রতে দীক্ষিত যুবকদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র আন্তরিকতার সহিত উক্ত দলে

যোগদান করেন। মির্জাপুর স্ট্রীটে ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্তানায় তখন যে যুবকদল দেশের ও জাতির শৃঙ্খল মোচনের আলোচনায় মত্ত থাকত, আজ তাদের প্রায় সকলেই জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, রাজনীতি ও সমাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

১৯১৯ সনে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সমগ্র দেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ১৯২০ সনে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মিগণ এমন সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে পারলেন না। ডক্টর ঘোষ তখন টাকশালে সহকারী অ্যাসে-মাষ্টারের পদে সমাসীন। এর পূর্বে অন্য কোন ভারতবাসী এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদলাভ করে নাই। আজীবন দারিদ্র্যের সংগে লড়বার পর রাজকীয় সম্মান, মর্য্যদা ও মোটা মাহিনার চাকুরী যখন করায়ত্ত তখনই এল দেশের ও দশের জন্য কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বান। মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না করে অবহেলা ভরে পদত্যাগ করে প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গরীবের ঘরে জন্মলাভ করে দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করবার পর বহু সাধনা ও আয়াসলব্ধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা-পূর্ণ এমন সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করা যে কতখানি

ত্যাগ ও সবল চিত্তের লক্ষণ, তা কল্পনা করাও সহজ নহে।

১৯২০ সনেই ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহকর্মীদের সহযোগে অভয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং ডক্টর ঘোষ ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। চাকুরী পরিত্যাগ করার পর প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সহকর্মিগণসহ ঢাকায় গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ সনে তিনি তাঁর স্বগ্রাম মালিকান্দায় কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরেই তিনি আইন-অমান্য করার অপরাধে দশ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৩ সনে কুমিল্লা সহরে অভয় আশ্রমের প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভয়-আশ্রমের কর্মিবৃন্দ প্রধানতঃ ত্রিপুরা জেলার মধ্যেই নিজেদের কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করেন। ১৯২৪ সনে নিজেদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র অভয় আশ্রম পরিত্যাগ করে খাদি-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। কিন্তু এক বৎসর কাল পরে খাদি-প্রতিষ্ঠানের সংগেও নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। তখন তিনি খাদি-প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে পুনরায় অভয়-আশ্রমে যোগদান করেন।

১৯৩০ সনে লবণ-সত্যাগ্রহ স্থরু হলে প্রফুল্লচন্দ্র একদল সহকর্মী নিয়ে কাঁথি যাত্রা করেন। তাঁর পরিচালিত সত্যাগ্রহী দলই বাংলায় সর্বপ্রথম লবণ আইন ভংগ করেন। আইন-অমান্যের ফলে প্রফুল্লচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে দু' বৎসর

সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা অর্থদণ্ড—অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৩২ সনে অভয়-আশ্রমকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ১৯৩২-৩৪ সনের আইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি যথাক্রমে এক বৎসর তিন মাস ও দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩৫ সনে কারামুক্তির পর ডক্টর ঘোষ কলিকাতায় এসে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি অখিল-ভারত-গ্রাম-উদ্যোগ-সংঘের বাংলা শাখার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। পরে হরিজন-সেবক-সংঘের বংগীয় শাখার সভাপতি হন। পশ্চিমবংগে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সভাপতিত্বে পশ্চিমবংগ দুর্ভিক্ষ সাহায্য-সমিতি গঠিত হয়।

১৯৩৯ সনে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সংগে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নীতিগত বিরোধ বাধলে ডক্টর ঘোষ সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেন। এপ্রিল মাসে সুভাষ-চন্দ্র পদত্যাগ করলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর স্থলে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বাংলা দেশ থেকে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্য মনোনীত করেন। সেই সময় হ'তে আজ পর্যন্ত প্রতিবারই ডক্টর ঘোষ ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্য মনোনীত হয়ে আসছেন। শুধু ১৯৪৬ সনে পণ্ডিত জহরলালের সভাপতিত্বকালে ডক্টর ঘোষ ওয়ার্কিং-কমিটিতে ছিলেন না। কিন্তু ঐ বৎসরেরই শেষ ভাগে আচার্য কৃপালানী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হ'লে তিনি পুনরায় ওয়ার্কিং-

কমিটির সভ্য মনোনীত হন। ইতিমধ্যে ১৯৪০ সনের যুদ্ধ-বিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে তিনি এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৪২ সনে কংগ্রেসের বিখ্যাত অগাষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের সংগে সংগে ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যের সংগে প্রফুল্ল-চন্দ্রকেও গ্রেপ্তার ক'রে আমেদনগর ফোর্টে বন্দী রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেংগে পড়ে এবং আরোগ্যের কোন আশা নাই দেখে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ১৯৪৫ সনের জানুয়ারী মাসে তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয়। জেলের বাইরে এসে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে থাকেন। অসুস্থ অবস্থায়ই তাঁকে কস্তুরবা-গান্ধী-স্মারকনিধির বাংলা-শাখার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৬ সনে সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রফুল্লচন্দ্র বংগীয়-কংগ্রেস নির্বাচন বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই তিনি ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সনের ২রা জুলাই পশ্চিম বংগ পরিষদ দলের কংগ্রেসী দলের নেতা হিসাবে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানান হ'লে তিনি ৯ জন সহকর্মী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু সমগ্র বাংলার লীগ-মন্ত্রিসভা তখন পর্যন্ত সক্রিয় থাকায় অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা সহকারে তাঁকে কাজ করতে হয়। এই সময় যে সাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা দুর্লভ। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার অব্যবহিত পরেই

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাংগা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ডক্টর ঘোষের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে স্বল্পকালের মধ্যে তা প্রশমিত হয়। ১৫ই অগাষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছুদিন পূর্বেই ঘোষ মন্ত্রিমণ্ডলী শাসন-ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন এবং পূর্ণোদ্যমে চোরাবাজার ও দুর্নীতি দমনের কাজ সুরু করেন।

মন্ত্রিত্ব লাভ করবার পরই তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেন যে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করাই তাঁর একমাত্র ব্রত। ধনী, জমিদার, পুঁজিপতি প্রভৃতি সকলকেই তিনি সাবধান করে দেন যে, লাভের লোভ পরিত্যাগ করতে না পারলে সরকার হ'তে আইন করে তাদের শোষণ-প্রবৃত্তিকে রোধ করা হবে। এসব কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতালোভী ও মুনাফাখোরদের মধ্যে অনেকেই ডক্টর ঘোষের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন এবং নানা উপায়ে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকেন।

কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র কারো হুমকীতে ভুলবার পাত্র নহেন। তিনি কঠোরহস্তে দাংগা দমন করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে সমর্থ হন। ১৫ই অগাষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন কলিকাতার রাস্তায় ঘাটে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়, তা প্রফুল্লচন্দ্রেরই শাসন-পরিচালনার নৈপুণ্যের পরিচায়ক। চোরাবাজার এবং দুর্নীতি দমনে তাঁর অভিযান জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে এবং মুনাফাখোরদিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। সরকারী

অফিসসমূহে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন করে তিনি এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। বিভিন্ন দিকে যাতে কংগ্রেসের নির্বাচনী-ইস্তাহার অনুযায়ী কাজ করা হয়, তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন। অল্পকাল মধ্যে পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবর্ষের অন্যান্য মন্ত্রিমণ্ডলীর চেয়ে অধিকতর বিপ্লবাত্মক নীতির প্রবর্তন ক'রে সকলের পুরোভাগে আসন পায়।

বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হয়েও শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চাকে প্রফুল্লচন্দ্র দূরে সরিয়ে রাখেন নি। বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ তিনি বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পড়েন। হিন্দু ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি পড়াশুনা করেছেন প্রচুর। তাঁর রচিত 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর রচিত "সাধারণ জ্ঞান" এবং "বিজ্ঞানের কথা" বাংলা ভাষায় এ ধরণের প্রথম পুস্তক। রচিত হবার সংগে-সংগেই এগুলো সর্বত্র বিপুল সমাদর লাভ করে। ডক্টর ঘোষের রাজনীতি সম্বন্ধীয় বই 'From Nagpur to Lahore'— জাতীয় আন্দোলনের ১০ বৎসরের ইতিহাস। এ ছাড়া মেদিনীপুর জেলা-কংগ্রেস-কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র জানার সহযোগে তিনি গান্ধীজী প্রণীত 'গীতাবোধ' মূল গুজরাটি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্রের আকৃতিতে কোনই

বৈশিষ্ট্যের ছাপ নাই। তাঁর কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত এবং একটু রুক্ষও বলা চলে। ভাবপ্রবণতার স্থান তাঁর মধ্যে একেবারেই নাই। কঠোরতার সংগে শৈশব হ'তে লড়তে হয়েছে বলেই হয় তো কোমল অনুভূতিগুলিকে কথায়-বার্তায়, আচারে-ব্যবহারে রূপায়িত ক'রে তোলা তাঁর পক্ষে দুরূহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অন্তরে দৃষ্টির অগোচরে স্নেহ ও করুণার যে ফল্গুধারা বইছে, নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হ'লে কারও তা বুঝবার উপায় নেই। কর্তব্যের সামান্যতম অবহেলা বা ত্রুটি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না—এমন কি ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদেরও নহে। কঠোরতা ও সংযমপূর্ণ জীবন যাপনের ফলে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রকৃতি একটু রুক্ষ। কেউ কেউ বলেন যে, বিবাহ না করে আজীবন কৌমার্য ব্রত অবলম্বনই এর কারণ। কিন্তু তিনি যেমন অল্পে ক্রুদ্ধ হন, তেমনি স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর রাগও থেমে যায়। তিনি মনে যা ভাবেন, মুখে তা বলতে কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করেন না। এই অপ্রিয় সত্যভাষণের ফলে খ্যাতি এবং অখ্যাতি উভয়ই তাঁর কপালে জুটেছে প্রচুর। অসাধারণ কর্মশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অফুরন্ত দরদের সংগে প্রফুল্লচন্দ্র আজ গান্ধিজীর আদর্শে পশ্চিমবাংলা তথা সমগ্র ভারতের জনসাধারণের আশা আকাংখাকে রূপদান করবার সাধনায় মগ্ন আছেন। ভবিষ্যৎই বলতে পারে, তাঁর এ সাধনা ও স্বপ্ন সফল হবে কিনা। বর্তমানে তিনি আর পশ্চিমবংগের প্রধান মন্ত্রী নেই।

কংগ্রেসে-পরিচালক মণ্ডলীতে একই সংগে দু'জন নারীর স্থান অভূতপূর্ব। ভারতের নারীগণের পরিমাপ এই ঘটনা থেকে করা যায়। আজিকার রাজনৈতিক গগন, বিশিষ্ট সংগ্রামিকায় পরিপূর্ণ! শ্রীমতী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী, সুচেতা দেবী, মৃদুলা সরাভাই (কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদিকা,) কমলা দেবী, অরুণা, লক্ষ্মী স্বামীনাথন—আরও কত দেশপ্রাণা রমণীর কীর্তিপ্রভায় আমাদের বর্তমান ইতিহাস প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার কবি একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন,—"না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না, জাগে না!" আজ আর সেই আক্ষেপ করবার প্রয়োজন নেই। স্বদেশে-বিদেশে আজ ভারতীয় নারীর গৌরবগাথা প্রচারিত হচ্ছে। শক্তিরূপিনী নারী আজ বিজয়শংখে ফুঁ দিয়েছেন, ভারতের—নবপ্রভাত আগতপ্রায়।

১৯০৩ সালে দক্ষিণ কানাড়ার এক সারস্বত পরিবারে কমলা দেবীর জন্ম হয়। মাদ্রাজে ও পরে লণ্ডনে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিলাতে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতি তাঁর পাঠ্য ছিল। তিনি অল্পবয়সেই বিধবা হ'ন। পরে সুকবি হারীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর বিয়ে হয়। বর্ত্তমানে তাঁদের যোগবিচ্ছিন্ন হয়েছে। কমলা দেবী সুলেখিকা, সুবক্তা, সুঅভিনেত্রী এবং প্রবীন কংগ্রেস-কর্মী। ১৯২২ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। বর্ত্তমানে সমাজতন্ত্রীদলের তিনি প্রেরণা ও স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর ইংরাজী রচনার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতা শোন্‌বার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় কর্‌ত। তিনি বিদেশে ভারতীয় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্যে।

বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে। সকল বিষয়েই তাঁর চরিত্র শ্রীমতী নাইডুর সংগে তুলনীয়। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি,—প্রতি বিভাগে তাঁর দান অক্ষয় হয়ে থাকবে। ভারতের নারী-আন্দোলনকে সার্থক করে তুলেছেন প্রধানতঃ এই দু'জন। স্বদেশের প্রতি অনুরাগে কমলাদেবী কারুর চেয়ে কম নন। পণ্ডিতজীর মতই তিনি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন। চীন, আমেরিকা, স্পেন, সব জায়গার সমস্যাই তিনি নিজের সমস্যা বলে ভাবেন। নিখিল জনগণের মুক্তিকামনাই তাঁকে একান্তভাবে স্বদেশানুরাগী করে তুলেছে।

চাষী-মজুরের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য। ভারতের আত্মঘাতী ধনবৈষম্য দূর করাই তাঁর লক্ষ্য। শ্রীমতী কমলার এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী প্রগতিবাদী সমাজ থেকে প্রচুর সমর্থন পেয়েছে।

আইন-অমান্য আন্দোলনে শ্রীমতী কমলাদেবীর অংশ গ্রহণ ভারতের নারী-সমাজকে মুক্তিসংগ্রামের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। নিখিল ভারত কিষাণ-সংঘের তিনি অন্যতম অধিষ্ঠাত্রী। ১৯৪৪-৪৫ সালে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন কমলা দেবী। বিদেশে বহুবার তিনি ভারতীয় নারী-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চারজন এশিয়াবাসিনীর মধ্যে তিনি একজন। এই তেজস্বিনী রমণী বহুবার সরকারী নির্দেশ, পুলিশের আদেশ উপেক্ষা করে নির্যাতিতা হয়েছেন। অদম্য মানসিক শক্তির অধিকারিণী তিনি। ১৯২৯ সালে কমলা দেবী বোম্বাই প্রাদেশিক যুবসম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি 'The Awakening of Indian Womanhood' 'In War-torn China, 'Japan—its Weakness and Strength' প্রমুখ বইগুলি লিখে যশস্বিনী হয়েছেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল—বর্তমানে সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মপরিষদে কমলাদেবীই একমাত্র মহিলা সদস্য। বামপন্থী নেত্রীদের শীর্ষস্থানীয়া তিনি। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। দেশীয় রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে

কমলাদেবীর উৎসাহের অন্ত নেই। তাঁর জনগণের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হোক্, এই কামনা জানাই।

কংগ্রেসের আদর্শ কমলা দেবীর চরম লক্ষ্য। বামপন্থী হয়েও তাঁর কংগ্রেসানুরাগ অনন্যসাধারণ। তিনি যুবসমাজের অত্যন্ত প্রিয়। একদিন যিনি বসন্ত-সেনার ভূমিকায় রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, আজ তিনি সংগ্রামিকার বেশে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত; ভবিষ্যৎ তাঁর অতুল প্রতিভা ও কর্মোদ্যমের সাক্ষ্য দেবে। আমাদের সৌভাগ্য, এমন বহু-গুণবতী নেত্রীকে আমাদের মাঝে পেয়েছি,—তাঁর অমরবাণী শুনে ধন্য হয়েছি।

সুপ্তা শক্তি আজ জাগ্রতা হয়েছেন। অমানিশার অন্ধকার কেটে গিয়ে উষার উদয়-লেখা ভারতাকাশকে রক্তিম করে তুলেছে। অভিযাত্রী-বাহিনী চলেছে দীর্ঘপথ বেয়ে, বিপদসংকুল পাথার পার হয়ে—এক হাতে জয়নিশান নিয়ে পুরোভাগে চলেছেন সংগ্রামিকার দল, অন্য হাতে বিজয়-শঙ্খ। তার উদাত্ত গর্জনে দিগ্বিদিক্ মুখরিত হয়ে উঠেছে।

পরিশিষ্ট (ক)

জাতীয় পতাকার ব্যাখ্যা

জাফরাণ—ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রতীক
সাদা—পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক
সবুজ—শৌর্য ও সাহসের প্রতীক
মধ্যবর্তী চক্র—চরকা এবং অশোকের ধর্মরাজ্যের প্রতীক

১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গণ-পরিষদে জাতীয় পতাকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ঃ—

"সমান্তরালভাবে সজ্জিত গাঢ় জাফরাণ, সাদা ও সবুজ—এই তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরী হইবে। সাদা অংশের কেন্দ্রস্থলে চরকার প্রতীক হিসাবে শোভা পাইবে গাঢ় নীল রং-এর চক্র। এই চক্র সারনাথের অশোক-স্তম্ভের উপর অংকিত অশোক-চক্রের অনুরূপ এবং ইহার ব্যাস হইবে পতাকার সাদা অংশের প্রস্থের সমান। সাধারণতঃ পতাকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থের দেড়গুণ হইবে।"

এই প্রস্তাবে পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা কংগ্রেস কর্তৃক

গৃহীত জাতীয় পতাকারই অনুরূপ। পার্থক্যের মধ্যে শুধু মধ্যের সাদা অংশে চরকার স্থানে চরকারই প্রতীক হিসাবে অশোক-চক্রকে স্থান দেওয়া হইল। বিভিন্ন বর্ণের ব্যাখ্যা বা তাৎপর্যের কোন পরিবর্তন করা হইল না।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় পতাকার আদর্শ এবং কেন এই পতাকা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ—

"বলিতে গেলে এই পতাকা ঠিক কোন প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারী-ভাবে কখনই গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার পিছনে আছে জনসাধারণের স্বীকৃতি ও সার্বজনীন ব্যবহার এবং সর্বোপরি পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিকদের আত্মবলি। আমরা জনমতকেই সমর্থন করিতেছি মাত্র। বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে এই পতাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভুল বুঝিয়া পতাকার বর্ণ তিনটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু একথা আমি বলিতে পারি যে, পতাকা উদ্ভাবনের সময় ইহার পিছনে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ছিল না। আমরা একটী সুদৃশ্য পতাকার কথাই ভাবিয়াছিলাম; কারণ, একটী জাতির প্রতীক-চিহ্ন সুদৃশ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের কল্পনা হিসাবে আমাদের দেশের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, কর্ম্মধারা, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতির সমগ্র অংশে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া আসিতেছে, তাহা যেন পতাকার এই বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া রূপায়িত

হইয়া উঠে। ইহাই ছিল পতাকা পরিকল্পনার গোড়ার কথা। শুধু চারুকলার দিক দিয়া বিচার করিলেও আমাদের এই পতাকা খুব সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহা ছাড়া মন ও আত্মার বিকাশলাভের উপযোগী আরও অনেক জিনিষ ইহার মধ্যে মুর্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা শুধু ব্যক্তিবিশেষের জন্যই প্রয়োজন ... তর উন্নতির পক্ষেও অপরিহার্য।

"এতকাল আমরা যে, পতাকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তাহারই সামান্য একটু পরিবর্তন করিয়া বর্তমান পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। পতাকায় পূর্বের মতই গাঢ় জাফরাণ, সাদা ও সবুজ বর্ণের সমাবেশ রহিয়াছে। সাদা অংশে জনসাধারণের আশা-আকাংখার ও শ্রমের প্রতীক হিসাবে একটী চরকা অংকিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে আমরা এই চরকার বাণী গ্রহণ করিয়াছি। বর্তমান পরিকল্পনায় এই চরকাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয় নাই। সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে মাত্র। কেন এই পরিবর্তন করা হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণতঃ পতাকার এক পৃষ্ঠে যে প্রতীক চিহ্ন থাকে, অপরদিকেও অনুরূপ চিহ্ন থাকা উচিত। তাহা না হইলে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম হয়। পূর্বেকার পতাকায় অংকিত চরকার চক্র এক দিকে এবং টাকু অন্য দিকে থাকায় বিপরীত দিক হইতে দেখিলে চক্র ও টাকু উল্টা দিকে দেখায়। চক্রটি পতাকা-দণ্ডের দিকে অবস্থিত থাকিবার কথা—পতাকার অগ্রভাগে নহে। চরকার এই সব ব্যবহারিক অসুবিধা

রহিয়াছে। প্রতীক হিসাবে চরকা এতকাল জনসাধারণের মনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে পতাকার ছাপ চরকাই রাখিতে হয়; কিন্তু অন্য অসুবিধাটুকুও দূর করা দরকার। তাই মালদড়ি ও টাকু অসুবিধাজনক বিধায় এই দুই অংশ বাদ দিয়া চরকার মূল অংশ চক্রটিকে পতাকার বুকে স্থান দেওয়া হইল।

"অতএব চরকার স্থান অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ প্রকারের চক্র আমাদের গ্রহণ করা উচিত? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা অনেক চক্রের কথাই ভাবিয়াছি; অবশেষে সারনাথের অশোক-স্তম্ভের উপর অংকিত বিখ্যাত চক্রের প্রতিই আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই চক্র ভারতের অতীত সংহতির প্রতীক, প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রতীক হিসাবে পতাকার বুকে এই চক্রেরই স্থান পাওয়া উচিত। এই চক্রের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজ অশোকের নামের সহিত আমাদের জাতীয় পতাকার সংযোগ সাধিত হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।"

পতাকার আকার সম্বন্ধে জওহরলাল বলেন: "প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ পতাকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থের দেড় গুণ হইবে। 'সাধারণতঃ' কথাটি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই

পরিমাপ অপরিবর্ত্তনীয় নহে; কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সামান্য অদল বদল হইতেও পারে। মাপ সম্বন্ধে তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। দৈর্ঘ ও প্রস্থের বাঁধা-ধরা মাপ ঠিক রাখাই বড় প্রশ্ন নহে, আসল কথা হইতেছে স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী পতাকা তৈরী করা।"

পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবিত অশোক-চক্র সম্পর্কিত ত্রিবর্ণ পতাকা গণ-পরিষদ কর্তৃক জাতীয় পতাকারূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং পরিষদের মুসলীম সদস্যগণও উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন।

আজিকার স্বাধীন ভারতে এই চক্রচিহ্নিত পতাকাই জাতির প্রাণ এবং প্রতীক স্বরূপ রহিল।

পরিশিষ্ট (খ)

স্বাধীনতা দিবসের প্রতিজ্ঞা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা লাভ করিবার ও স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী সর্বপ্রকার উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার রহিয়াছে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গভর্ণমেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন বা উচ্ছেদ-সাধন করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করে নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বনাশসাধন করিয়াছে। সুতরাং, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।

আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা হিংসানীতি নহে। ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ ও

বৈধ উপায়ে যথেষ্ট শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করিয়াছে এবং স্বরাজলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই পথ অনুসরণ করিলেই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা নূতন করিয়া পণ লইতেছি এবং যতদিন না ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ লাভ হয় ততদিন ধরিয়া অহিংসার পথে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত করিবার জন্য গভীর নিষ্ঠাসহকারে সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।

আমাদের বিশ্বাস যে, সাধারণভাবে অহিংস কর্মপ্রচেষ্টা এবং বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অহিংস সংগ্রামের আয়োজনের নিমিত্ত আজ দেশের সমক্ষে উপস্থিত ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যক্রম সাফল্যের সহিত কার্যকরী করা প্রয়োজন—বিশেষতঃ খাদি, সাম্প্রদায়িক সমন্বয় এবং অস্পৃশ্যতা বর্জন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সদিচ্ছা প্রচারের জন্য আমরা প্রতিটি সুযোগের অন্বেষণে থাকিব। যাহাদের অবহেলা করা হইয়াছে তাহাদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা পাইব এবং যাহারা অনুন্নত ও অনগ্রসর বলিয়া বিবেচিত হয়, আমরা সর্বপ্রকারে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইব।

আমরা জানি যে, যদিও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তথাপি সরকারী অথবা বে-সরকারী কোন ইংরাজের সহিত আমাদের কলহ নাই। আমরা জানি যে, বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে যে সকল বৈষম্য আছে, তাহা

দূর করিতেই হইবে এবং হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও কার্যকলাপে ঐ সকল বৈষম্য অহিংস আচরণের পক্ষে বাধাস্বরূপ। আমাদের ধর্মমত পৃথক হইতে পারে, কিন্তু আমরা সকলে একই ভারত-মাতার সন্তান —পরস্পরের সহিতএকই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে জড়িত; সুতরাং কর্মক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের প্রতি তদনুরূপ প্রীতিপূর্ণ আচরণ করিব।

ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের পুনর্গঠন এবং জনগণকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চরকা ও খাদি আমাদের গঠনমূলক কার্যক্রমের অপরিহার্য অংগ। অতএব নিজের নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রের জন্য খাদি ব্যতীত অপর কিছু ব্যবহার করিব না, যতদূর সম্ভব একমাত্র কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব এবং অপরে যাহাতে সেইরূপ করে, তাহার চেষ্টা করিব। গঠনমূলক কার্যক্রমের এক অথবা একাধিক অংগকে কার্যকরী করিবার জন্যও আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

যাঁহারা বিগত সংগ্রামের কঠিন দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছেন, লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছেন এবং স্ব স্ব জীবন ও ধনসম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছেন, আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে সেই সহস্র সহস্র সহকর্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি; তাঁহাদের ত্যাগে আমাদের সর্বদা এই কর্তব্যই স্মরণ করাইয়া দিবে যে, অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই।

কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা

আমরা নিখিল ভারত জাতীয়-মহাসভা কর্তৃক ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে গৃহীত প্রস্তাব পুনরায় সমর্থন করিতেছি। ইহাতে ভারত ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য এবং সকলের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষ হইতে অবিলম্বে ইংরাজ শাসনের অপসারণ দাবী করা হইয়াছে।

আজ আমরা পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা শৃংখলার সহিত কংগ্রেসের নীতি ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করিব এবং কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। 'বন্দে মাতরম্'

পরিশিষ্ট (গ)

আগষ্ট প্রস্তাবের সারাংশ

বম্বে, ৮ই আগষ্ট ১৯৪২, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক আলোচিত ও গৃহীত স্মরণীয় আগষ্ট প্রস্তাবের সারাংশ

আগষ্ট বিপ্লবের দীপশলাকা এই ঐতিহাসিক "ভারত ছাড়" প্রস্তাব, ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। আজিকার দিনে প্রত্যেক দেশবাসী ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করুন।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, কংগ্রেসের এই বিশ্বাসকেই দৃঢ়তর করিয়াছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান প্রয়োজন। পরাধীনতার গ্লানি সর্বকাল ও সর্বতোভাবে অকল্যাণের বাহন—পরাধীনতা হইতে মুক্তির চেষ্টা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু আজ আরও গুরুতর অবস্থা উপস্থিত। শত্রু দ্বারে, কিন্তু দাসত্বভারে অবসন্ন ভারত আত্ম-রক্ষার অধিকারহীন। মহাযুদ্ধের দাবাগ্নিতে পৃথিবী পুড়িয়া ক্ষার হইতেছে, কিন্তু স্বাধীন জাতির মর্যাদাহীন আজিকার ভারত বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োজনের অধিকার হইতেও বঞ্চিত।

সেইজন্য আজ ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে, ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য, বিশ্ব-কল্যাণের জন্য! নাজি, ফ্যাসি, সাম্রাজ্যবাদী ও রণলিপ্সু দস্যুদের কবল হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাহার যোগ্য অংশ গ্রহণ একমাত্র ভারতই করিতে পারে।

কংগ্রেস রণ-লিপ্সু ব্রিটিশকে বিব্রত না করার নীতিই অনুসরণ করিয়াছে। কংগ্রেস একক সত্যাগ্রহের দ্বারা তাহার ন্যায়সংগত স্বাধীনতার দাবীকে ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, ব্যাপক আন্দোলনে তাহাকে পুষ্ট করে নাই, বিব্রত ব্রিটিশকে বিপর্যস্ত করিতে চাহে নাই। আশা, তাহার মৈত্রীভাব ব্রিটিশ-বিবেকের রুদ্ধ দ্বারকে যুক্ত করিবে, দেশ-নেতাদের হাতে শাসন-ক্ষমতা অর্পিত হইবে। স্বাধীন ভারত বিশ্ব-সমরকে মানবের প্রকৃত মুক্তি-সংগ্রামে পরিণত করিবার কার্যে দায়িত্ব গ্রহণ ও কর্তব্য পালনের সুযোগ লাভ করিবে। কিন্তু এই আশা আজ দুরাশা। ব্যর্থকাম 'ক্রীপস্ দৌত্য' আজ স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, ব্রিটিশ মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই, তাহার অধিকার যথাপূর্ব বলবৎ রাখার সংকল্প অটুট! ক্রীপস্ সাহেবের সহিত আলোচনা কালে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ, জাতির দাবীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ন্যূনতম দাবীই জানাইয়াছিলেন; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এই ব্যর্থতার ফলে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও জাপান-প্রীতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটী এই গতি লক্ষ্য করিয়া শংকিত; কারণ,

বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের মনোভাবেই ইহার অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণতি। কমিটির মতে আক্রমণের প্রতিরোধ-বাসনাকেই দৃঢ় ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে; মালয়-সিংগাপুর-ব্রহ্মের পুনরভিনয়ের সম্ভাবনাকে সুদূরাপরাহত করিয়া বৈদেশিক আক্রমণের বিরোধী মনোভাব রচনা করিতে ও তাহার দুঃখ-বেদনার ভাগ লইতে কমিটি উৎসুক, কিন্তু কমিটি মর্মে মর্মে জানে যে, ইহা কেবল তখনই সম্ভব যখন ব্রিটিশ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাহার শাসন অধিকার ত্যাগ করিবে এবং যখন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ এক নবলব্ধ স্বাধীনতার উদ্দীপনায় আলোড়িত হইয়া উঠিবে।

কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের যথা-শক্তি চেষ্টা করিয়া সে ক্ষেত্রেও বুঝিয়াছেন যে, বৈদেশিক-শাসন কায়েম থাকা কালে কোন সাধনাই সম্ভব নহে। বৈদেশিক শাসন ও হস্তক্ষেপের অবসানেই ভারতের সকল সম্প্রদায়, দল ও উপদল বাস্তব দৃষ্টি লইয়া আপন আপন সমস্যার বিচার করিতে পারিবেন এবং তখনই সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হইবে। বিদেশী শাসকের উপস্থিতিতে খণ্ড স্বার্থগুলি অস্বাভাবিক স্ফীতি-লাভ করিয়া বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বিদেশী শাসকের অনুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ লক্ষ্য করিয়া যে সব রাজ-নৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে ও সুখ-সুবিধা লাভের জন্য যাহারা নিত্য কলহপরায়ণ, বিদেশী শাসনের অন্তর্ধানের সংগে সংগে তাহাদের মনোভাবের পরিবর্তন হইতেই হইবে।

স্বাধীন ভারতে ইহাও পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে, রাজন্য-বর্গ, জায়গীরদার, জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের সকল সম্পদের মূল হইতেছে কৃষক ও শ্রমিক এবং সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এই কৃষক ও মজদুর প্রজারই প্রাপ্য অধিকার বলিয়া তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত হইবে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ভারতের দায়িত্বশীল নরনারী অগ্রসর হইয়া কার্যকরী শাসকমণ্ডলী গঠন করিবেন। এই শাসকমণ্ডলীতে ভারতের সকল দল ও শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকিয়া এক শাসনতন্ত্র রচনা-পরিষদ সংগঠন ও আহ্বান করিবেন—ইহারা স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচনা করিবেন যে, শ্রেণী-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই সন্তোষজনক হয়। তখন স্বাধীন ভারত ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হইয়া আসন্ন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের যুক্ত-পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন এবং পারস্পরিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ নির্ধারণ ও যথোচিত চুক্তি-সন্ধিও করিতে পারিবেন। সমানে সমানেই কেবল সম্মান-জনক সহযোগিতা সম্ভব।

জনগণের ঐক্যবদ্ধ আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় আক্রমণের প্রতিরোধই কংগ্রেসের একান্ত ইচ্ছা। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান-প্রস্তাবে, ও তাহা কার্যকরী করিবার চেষ্টাতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অপরিহার্যতাই সূচিত হইতেছে। পরন্তু ব্রিটিশ বা মিত্রশক্তিকে বিপর্যস্ত করিবার, তাহাদের যুদ্ধোদ্যমে বিঘ্ন ঘটাইবার কামনা কংগ্রেসের বিন্দুমাত্র নাই;

জাপান প্রমুখ চক্রশক্তির দ্বারা ভারত আক্রমণে বা চীন দলনে উৎসাহ বা সুযোগদান কংগ্রেসের আদৌ অভিপ্রেত নহে। এমন কি মিত্রশক্তির আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেও কংগ্রেস চাহে না। সেজন্য জাপান বা অন্য কোনও বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এবং আক্রান্ত চীনকে সক্রিয় সাহায্যদানের জন্য স্বাধীন ভারতে মিত্রশক্তির প্রয়োজনমত সৈন্য সমাবেশেও কংগ্রেসের কোন আপত্তি নাই।

ভারত হইতে ব্রিটিশ অধিকার অপসারণের অর্থ ব্রিটিশ মাত্রেরই ভারত ত্যাগ বুঝায় না—শাসনের অবসানই বুঝায়। যে ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয়দের আপনজন সমকক্ষ হইয়া এখানে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে কোনও বাধাই উক্ত প্রস্তাবের ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে না। যদি এইরূপ অপসারণ বা শাসনের অবসান সদ্ভাবে ও সদিচ্ছার সহিত সংঘটিত হয়, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে অবিলম্বে স্থায়ী ও সুশৃংখল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বচ্ছন্দে আক্রমণ প্রতিরোধ-কার্যেও চীনকে সাহায্যদানে ভারতের সহযোগিতা লাভ করিবে।

এই কার্যক্রমে যে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা কংগ্রেস ভাবিয়া দেখিয়াছে; কিন্তু এইরূপ বিপদ যে-কোন দেশকেই স্বাধীনতা লাভের জন্য বরণ করিয়া লইতে হয়। বিশেষ করিয়া আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে যখন বিশ্ব-স্বাধীনতাই বিপন্ন ও পরিত্রাণের জন্য স্বাধীন ভারতের সহযোগিতা অপরিহার্য, তখন ওই বিপদ

ও অসুবিধার জন্য ইতস্ততঃ করা চলে না। কংগ্রেস আজ স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোনও আকস্মিক বা অদূরদর্শী কার্যের দ্বারা সে মিত্রশক্তিকে তাঁদের বহু-বিঘোষিত ও সকলের ঈপ্সিত বিশ্বমুক্তি-প্রচেষ্টাকে বিড়ম্বিত করিতে অনিচ্ছুক। যদি ব্রিটিশ সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কংগ্রেসের এই যুক্তিসংগত প্রস্তাব ও ন্যায্য দাবী মানিয়া নেন, তাহা হইতে সুখের আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে কেবল ভারতেরই স্বার্থ সাধিত হইবে না, ব্রিটিশেরও মঙ্গল হইবে এবং বিশ্বমুক্তি-চেষ্টার শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু যদি ব্রিটিশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে কংগ্রেস অবস্থার দ্রুত অবনতি ও দেশের আসন্ন সংকট নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া দেখিতে পারে না; ভারতের আত্মরক্ষার ইচ্ছা পর্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা কংগ্রেস সহ্য করিবে না। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও কংগ্রেসকে তাহার ১৯২০ হইতে আজ পর্যন্ত অর্জিত অহিংস শক্তি ও বিশ্বাস-বলকে একত্র সংহত করিয়া দেশব্যাপী এক তুমুল সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে; এইরূপ সংগ্রামের নেতৃত্ব করিতে পারেন ও করিবেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২০ হইতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে যে আহিংস নীতি গৃহীত হইয়াছিল, আজও সে তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে না।

এই প্রস্তাবের ফলাফলের উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, মিত্রশক্তিরও করিতেছে। অতএব ওয়ার্কিং কমি

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৭ই আগষ্ট বোম্বাই অধিবেশনে উত্থাপিত করা সমাচীন মনে করেন।

স্মরণীয় ৮ই আগষ্ট বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি উপরোক্ত প্রস্তাবের সম্পূর্ণ ও সানন্দ অনুমোদন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি অতিরিক্ত যোগ করেন।

সংক্ষিপ্তসার :—

১। মিত্রশক্তির সাফল্যের অভাবের জন্য তাহাদের নীতিই দায়ী। বিশ্বমুক্তির সংগ্রাম বলিয়া বহু-বিঘোষিত হইলেও ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম রাখাই তাহাদের প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহা পরিহার না করিলে সাফল্য আসিবে না। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা তাহাদের নীতি পরিবর্তনের সূচনা করিতে পারে।

২। ভারতের স্বাধীনতা হইবে এশিয়ার সমস্ত পদানত জাতির স্বাধীনতার অগ্রদূত। যুদ্ধান্তে পুরাতন উপনিবেশের উপর আধিপত্যের দাবী চলিবে না।

৩। ভারতের স্বাধীনতা কংগ্রেসের আশু লক্ষ্য—কিন্তু বিশ্ব ব্যাপারে কংগ্রেস উদাসীন থাকিতে পারে না। স্বাধীন জাতিপুঞ্জের যুক্তবিশ্বরাষ্ট্র রচনাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ইহার মধ্যে সকল জাতিরই প্রবেশ ও সমানাধিকার থাকিবে। যুক্ত বিশ্ব-রাষ্ট্রই জাতি-প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিয়া বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ভারতের ও অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা

করিয়া মিত্রশক্তি এই কল্যাণ-কর্মের প্রারম্ভ এখনই করিতে পারেন।

৪। কংগ্রেস ভারতের জনগণকে অহিংস সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও চালিত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে নেতৃত্ব অর্পণ করিতেছে ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক আন্দোলন অনুমোদন করিতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস বলিতে চায় যে, দেশব্যাপী আন্দোলন দ্বারা কংগ্রেস ক্ষমতা গ্রাসের অভিপ্রায় রাখে না, স্বাধীন ভারতে কর্তৃত্ব আসিবে জনগণের হাতে। কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য।—ব্রিটীশ—

ভারত ছাড়, ভারত ছাড়, ভারত ছাড়।

পরিশিষ্ট (ঘ)

ভারতীয় স্বাধীনতার সনদ

এই গণ-পরিষদ ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র-রূপে ঘোষণা করার অনমনীয় সংকল্প প্রকাশ করিতেছে এবং এই দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-কার্য্যের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে।

এই ইউনিয়ন গঠিত হইবে সেই সকল এলাকা লইয়া যেগুলি বর্তমানে ব্রিটীশ ভারতের বা সামন্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে আছে ও ভারতের অন্য যে সকল অংশ বর্তমানে ব্রিটীশ ভারত বা সামন্ত রাজ্য উভয়েরই বাহিরে রহিয়াছে

এবং এতদুপরি, যে সকল এলাকা ভারতের স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইতে ইচ্ছুক এবং

এই এলাকাগুলি তাহাদের বর্তমান সীমানা বা গণ-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অপর কোনও সীমানাসমূহ, প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়নের উপর যে সকল ক্ষমতা ও কার্যভার অর্পিত হইবে, অথবা স্বভাবতঃই যে সকল ক্ষমতা ও কার্যভার ইউনিয়নের হাতে আসিবে, তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং স্বশাসক এলাকার মর্যাদা অর্জন করিবে এবং এই সার্বভৌম স্বাধীন ভারতে, উহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অংশ ও শাসনযন্ত্রের সর্বক্ষেত্রে সর্ব-প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জনসাধারণের নিকট হইতেই লব্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং

এই ইউনিয়নে ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ যাহাতে সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার লাভ করে, আইনের চোখে সকলে সমতুল্য মর্যাদা ও সুযোগ পায়, ইউনিয়ন প্রবর্তিত বিধানাবলী এবং সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চিন্তা, ভাষা, বিশ্বাস, ধর্মমত, পূজার্চনা, বৃত্তি, সভাসমিতি ও কার্য্যের স্বাধীনতা অর্জন করে তাহার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইবে এবং উহা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা হইবে এবং

এই ইউনিয়নের সংখ্যালঘু, অনগ্রসর ও উপজাতীয় এলাকা-সমূহ এবং অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য পর্য্যাপ্ত

রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদ্দ্বারা সাধারণতন্ত্রের এলাকার অখণ্ডতা এবং সভ্য জাতিসমূহের দ্বারা স্বীকৃত ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ও বিধান অনুযায়ী জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে উহার সার্বভৌম অধিকার রক্ষিত হইবে এবং

এই প্রাচীনভূমি যাহাতে বিশ্বসভায় তাহার যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পনেরই আগষ্টের বিবৃতি

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক চির-স্মরণীয় দিন। এই দিন ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-বাদের গুরুভার উৎখাত হইতেছে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পুরুষানুক্রমে বীর সৈনিকদের দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জন আজ সুফল প্রসব করিয়াছে। যে ফল আমরা অর্জন করিয়াছি তাহা উৎপাদনের জন্য যাঁহাদের রক্ত ক্ষরিত হইয়াছে, যাঁহাদের অসীম পরিশ্রম করিয়া জলসেচ করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। সাহসী ও নিঃস্বার্থপর যে সকল দেশপ্রেমিক আমাদের মধ্যে—

রহিয়াছেন, তন্মধ্যে জাতির সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধার পাত্র নেতৃবর্গকে কেবলমাত্র নহে, অসংখ্য বীর সৈনিক, যাঁহারা ব্যক্তিগত পুরস্কারের আশা না করিয়া এবং ত্যাগের কোন-রূপ পরিমাপ না করিয়াই নির্জনে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

যে বিপ্লব এই দেশের স্বাধীনতার জন্মদান করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা এক অভূতপূর্ব সংঘটন। এইরূপ অল্প রক্তপাত এবং এইরূপ কম সংখ্যক হিংসার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোটি কোটি নরনারীর ভাগ্য পরিবর্তন-সূচক বৃহৎ ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই। এক পাশবিক শক্তির উপর অপর শক্তির বিজয় ইহা নহে, পক্ষান্তরে ইহা সাম্রাজ্যবাদের অন্ধ লোভের উপর স্বাধীনতা এবং মানবতার বিজয়যাত্রা। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণাময় নেতৃত্বের দরুণই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে এবং 'জাতির পিতা' যদি কাহাকেও বলা যায়, মহাত্মা গান্ধীই সেই যোগ্যতম ব্যক্তি। স্বাধীনতার অহিংস সংগ্রামে তিনি আমাদিগকে পরিচালিত করিয়াছেন এবং জনগণের সেবায় এই স্বাধীনতাকে নিয়োজিত করিবার পথও তিনিই দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্যই আমরা এতদিন সংগ্রাম করিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও আমাদের কোটী কোটী ভ্রাতা ও ভগিনী, কাল

কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা

যাঁহারা আমাদের স্বদেশবাসী ছিল, আজ তাহারা একটি পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া যাইতেছে। এই বিচ্ছেদ যতই বেদনা-দায়ক হউক না কেন আমরা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম; কেননা, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল; স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ঐক্য কালক্রমে অনৈক্যেরই সৃষ্টি করিত। স্বাধীনতা আজ অর্জিত হইয়াছে; পূর্বে যে ঐক্য আমাদের মধ্যে ছিল তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ঐক্য এইবার ফিরিয়া আসিতে পারে।

যুক্ত ভারতবর্ষের পূর্ণ মর্যাদা লইয়া স্বাধীনতা আসে নাই বলিয়া নিরাশ হইবার কিছু নাই। গত কয়েক মাসের মর্মপীড়াদায়ক ঘটনা যাহা ভাইকে ভাইয়ের বিপক্ষে লেলাইয়া দিয়াছে, জাতির উজ্জ্বল মুখ বিকৃত করিয়াছে, তাহা আমাদের হৃদয়ে এক গভীর কালিমাময় ছায়ার সঞ্চার করিয়াছে। যুদ্ধে আহত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিতে পারিলে সৈনিক যেরূপ আনন্দবোধ করে, ঠিক সেই মনোভাব লইয়াই আজিকার দিনটির শুভাগমে আমরা আনন্দবোধ করিতেছি।

যে স্বাধীনতা আমরা আজ অর্জন করিয়াছি, হয় তাহার সুব্যবহারে আমরা নিজ ভাগ্য গঠিত করিব অথবা অপব্যবহারে নিজ সর্বনাশ করিব। ইহাতে সর্বোচ্চ সুবিধা যেরূপ পাওয়া যাইবে, সর্বোত্তম দায়িত্বও সেইরূপ থাকিবে। যেকোন

ধর্মাবলম্বী, যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা যে-কোন সংস্থার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউক না কেন, ভারতীয় ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকের উপর এই সুবিধা ও দায়িত্ব সমভাবে বর্তাইবে। প্রত্যেক নাগরিককে তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সামাজিক সুবিচারের উপর ভিত্তি করিয়া এক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। এই নূতন সমাজে জনগণের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে এবং সকল নাগরিকই আত্মোন্নতি করিবার সমান সুবিধা পাইবে।

আমাদের শত্রু আজ বাহিরের নয়, নিজেদের মধ্যেই। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, ব্যাধি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের দরুণ অর্গলমুক্ত হিংসা এবং অনাচারই আমাদের প্রকৃত শত্রু। এই সকল শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, এবং এই সকল প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিপূর্বে প্রদর্শিত ত্যাগবরণ ও আত্মসংযম অপেক্ষা এই নূতন সংগ্রামে অধিকতর ত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন।

কংগ্রেস অকুণ্ঠভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, স্বরাজ বস্তুতঃ জনগণের জন্য হইতে পারে না, যদি না সেই স্বরাজের দ্বারা গণতন্ত্র, রাজনীতি হইতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সর্বস্তরে বিস্তারিত হয়। এইরূপ সমাজে সাধারণকে শোষণ করিবার কোন সুযোগই সুবিধাবাদী শোষকশ্রেণীর থাকিবে

না, অথবা বর্তমানের ন্যায় এইরূপ প্রকট অসাম্যও রহিবে না। এইরূপ সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে এবং আত্মোন্নতি করিবার সুযোগ ও সুবিধা প্রত্যেক নাগরিকের সমভাবেই থাকিবে। কেবলমাত্র এই সমাজ-ব্যবস্থায়ই সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক, ধনতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক এই তিন প্রকার শোষণের হাত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে। জনগণের সুখ সন্তোষ হইতে এই সমাজ প্রেরণা পাইবে এবং জনগণের স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য হইতেই ইহার ঐক্য সুগঠিত হইবে এবং এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টান্তই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়া তাহার মহৎ উত্তরাধিকারে অংশ গ্রহণ করিতে প্রেরণা দিবে। আজিকার দিনে এইরূপ সমাজ গঠনের দৃঢ় সংকল্প প্রত্যেক ভারতবাসী গ্রহণ করুক।

—সমাপ্ত—